১ শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন—প্রথম সংখ্যা

২ (অধ্যাপন।)

অর্থাৎ

অধ্যাপক কল্‌ডার্‌উড্‌ কৃত

ON TEACHING
ITS ENDS AND MEANS.

নামক গ্রন্থের

বঙ্গানুবাদ।

শিক্ষাপরিচয় হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত।

অনুবাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি. এ,

শিক্ষা-পরিচয় সম্পাদক।

কলিকাতা;

৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বরাট কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য আট আনা।
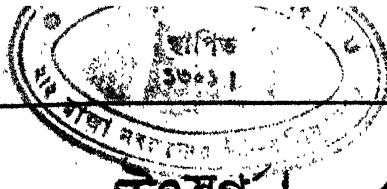
উৎসর্গ।
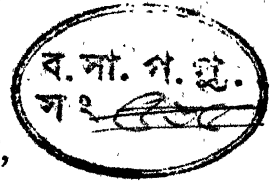
পরম সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ দাস,
বাল্য-শিক্ষক মহাশয় পরম সম্মানাস্পদেষু।

মহাত্মন্!

দূর দেশে সঙ্গিহীন, বিদেশী বালক এক,
অনাহারে, অনিদ্রায়, জ্বর-রোগে শীর্ণকায়,
কাতর নয়ন দুটি অশ্রু-জলে ছল ছল,
সুদীন মলিন বেশ—স্মরণে কি পড়ে তায়?
অতীত বরষ বহু, সে অতি পুরাণ কথা,
বিষয় সে অতি তুচ্ছ, নহে মনে থাকিবার;
বাল্যের সে কথা কিন্তু কল্যের ঘটনা সম
আজিও প্রাণের মাঝে জাগিতেছে অভাগার!
দয়া যে কেমন ধন, মিষ্টভাষ কিমধুর,
বিপদে আশ্বাস বাণী বিতরে কত যে বল,
দেখিয়াছি—বুঝিয়াছি সেই দিন আপনাতে,
আজিও শিখিনি কিন্তু দেবত্বের সে কৌশল!
শিখি নাই, শিখিব না এ জনমে ভাল কিছু!
এমন আদর্শ পেয়ে পড়িলাম কি জীবন!
উপহার দিতে বটে বাসনা হয়েছে আজ;
জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, পুণ্য—কি করেছি উপার্জ্জন?
শিক্ষা শিক্ষা বলে সদা বাল্যেতে যেমন ছিল,
আজিও নয়ন-জল তেমনি বহিছে হায়!
আপনার স্নেহ-দয়া আজিও তেমনি আছে,
ক্ষুদ্র এই উপহার শুদ্ধ সেই ভরসায়।

আপনার স্নেহের
শরৎ।
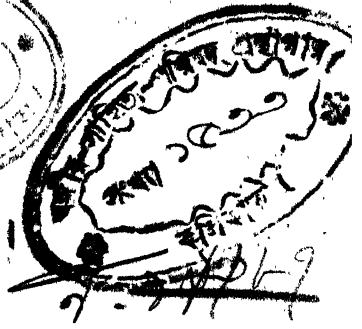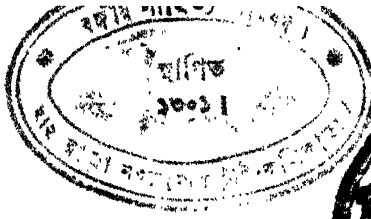
শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

কল্‌ডার উড্।

অধ্যাপন।

ইহার উদ্দেশ্য এবং উপায়।

অবতরণিকা।
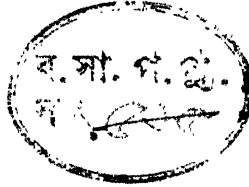
সকলেই স্বীকার করিবেন, যে যাহা জানে, কেবল তাহাই সে শিখাইতে পারে। কথাটা এতই পরিষ্কার, অথচ এতই গুরুতর যে. কিয়ৎপরিমাণে লব্ধ-জ্ঞান বলিয়া দেওয়া ভিন্ন অধ্যাপন আর কিছুই নহে, অনেকের মনেই এই সংস্কার জন্মিয়া যাইতে পারে। কোন দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ সংস্কারের খর্ব্বতা হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর উদ্ভাবনে এবং ইহার সফলতার উপায় নির্দ্ধারণে, আমাদের নিজের সুবিধার অনুরোধে, শিক্ষার গণ্ডীকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিতে আমাদিগের একান্ত প্রলোভন জন্মে। শিক্ষার ফলাফল নির্দ্ধারণ করিতে পরীক্ষা প্রথা সম্যক্-রূপে সমর্থ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও যখন আমরা উচ্চ অঙ্গের অধ্যাপনের বন্দোবস্ত করি, তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রধানতঃ এই প্রথার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। ফলতঃ অধ্যাপনার্থী যুবক শিক্ষকতার জন্য প্রস্তুত হইবার প্রথমাবস্থা হইতেই মনে করেন, তাঁহার লব্ধজ্ঞানের পরিমাণ যত অধিক হইবে এবং যত অধিক পরিমাণে তিনি তাহা অন্যকে অবগত করিতে পারিবেন, ততই তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতির সম্ভাবনা। তাঁহাকে শিক্ষকতার জন্য যাহা পড়িতে হয়, তাহাতে এ সংস্কারকে আরও বদ্ধমূল করে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য, একরূপ পরীক্ষা, উৎকর্ষের পরিমাপক, পদের তারতম্যদ্যোতক প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রশংসা পত্র, এ সমস্তই নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যকর্ত্তৃক সঞ্চিত জ্ঞান লাভ করাই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য, এ সমস্ত গুলিই সে বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করে। যে শিক্ষকের প্রশংসা-পত্র আছে, অবশ্যই সে প্রয়োজনানুরূপ সঞ্চিত-জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, সুতরাং সে শিক্ষাদানে সম্পূর্ণ সমর্থ, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। শিক্ষা-ব্যবসায়ের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, তাহা সে শিক্ষক লাভ করিয়াছে।

অধ্যাপনের উদ্দেশ্য যাহাতে এইরূপে সঙ্কীর্ণ না হয়, এইরূপ সংস্কারে যাহাতে নিজের নৈতিক এবং মানসিক প্রকৃতি খর্ব্বতা-প্রাপ্ত না হয়, সে পক্ষে অধ্যাপকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অপেক্ষাকৃত

উন্নত আদর্শে জীবন গঠন করিতে অধ্যাপকেরা যাহাতে পরস্পরকে সাহায্য করেন, সে পক্ষে অনেকটি গুরুতর যুক্তি রহিয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, অনেক শিক্ষকই উল্লিখিত বিপদের কথা অবগত আছেন, এবং যাহাতে সে বিপদ না ঘটে, এমন যত্নও করিতেছেন। *

প্রথ্যাপন অর্থাৎ সঞ্চিত জ্ঞান-বিতরণই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা স্বীকার করিলেও ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কেবল বিদ্যা থাকিলেই অন্যকে শিখান যায় না। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি জানা থাকিলেই কেহ শিক্ষক হইতে পারে না। যাঁহারা শিক্ষকতা অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহারা ছাত্রের আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই বুঝিতে পারেন, বিদ্যা এবং অধ্যাপনশক্তিতে প্রভেদ কত। তাঁহারা শিক্ষকদিগের মধ্যেও প্রভেদ দেখিতে পান। যিনি খুব বেশী জানেন, তিনিই যে খুব ভাল শিক্ষক বা প্রথ্যাপক, সকল সময়ে এমন ঘটে না। শিক্ষা-ব্যবসায়ে যিনি নূতন ব্রতী, এই প্রভেদের কথা তাঁহার চিরদিন মনে রাখা উচিত। ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়া যথাকালে শিক্ষকের আসনে উপবেশন করিলে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল সঞ্চিত বিদ্যায় কায চলে না, আরও কিছুর প্রয়োজন হয়। লিখিত পরীক্ষা-প্রণালী যাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই, বরং তাহাতে যাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, কার্য্য ক্ষেত্রে তাহা বাহির হইতে থাকে। শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে নূতন নূতন অভাব অনুভব হইতে থাকে। ছাত্রকে শিক্ষা দিতে দিতে শিক্ষা তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাকে আপনার শিক্ষক হইতে হইবে। প্রথমাবস্থায় কৃতকার্য্যতা এবং অকৃতকার্য্যতা উভয়ই ঘটিবে, কিন্তু এই উভয় হইতে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া অধিকতর কৃতকার্য্যতার জন্য ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে হইবে। যখন এইরূপ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে, তখনই শিক্ষকের কার্য্য প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইল বুঝিতে হইবে।

লেখক যে ভাবে শিক্ষা-তত্ত্ব-শিক্ষার কথা বলিতেছেন, তাহা নিয়ত গ্রন্থ পাঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এরূপ পাঠে জ্ঞান-পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে, মনোবৃত্তি কর্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু শিক্ষকের যে শিক্ষা ইহা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়, সুতীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে দিতে তাহা লাভ করিতে হইবে। যিনি শিক্ষকতায় পারদর্শী হইতে অভিলাষী, তাঁহাকে নিজের কার্য্যের সমালোচক হইতে হইবে। তাঁহাকে বিশেষ ঔৎসুক্যের

* পাঠক সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, বিলাতী গ্রন্থকার বিলাতের অবস্থা বর্ণনা করিতেতেছেন। অনেক কথা আমাদের দেশের পক্ষে খাটে, আবার অনেক কথাই খাটে না। দৃষ্টান্ত যথা, শিক্ষা ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া, সে জন্য অধ্যয়ন করা ও পরীক্ষা দেওয়া, ইত্যাদি প্রথা আমাদের দেশে এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাও ঠিক বিলাতের মত নহে।

অনুবাদক।

সহিত আপন কৃতকার্য্যতার সম্যক্ পর্য্যবেক্ষক হইতে হইবে। ডাক্তার আর্ণল্ড্ এক সময়ে কোন শিক্ষকের যোগ্যতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথাগুলি বড় সুন্দর; তিনি বলিয়াছিলেন, "গভীর বিদ্যাবত্তা অপেক্ষা মানসিক কার্য্যপরতা এবং শিক্ষা-কার্য্যে রুচিই আমি অধিক পছন্দ করি, কারণ বিদ্যাবত্তা অপেক্ষাকৃত সহজেই লাভ হইতে পারে।"

অনন্তর বিচার্য্য এই যে, সঞ্চিত জ্ঞান ছাত্রকে বলিয়া দেওয়াই অধ্যাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। একটা সামান্য কথা ধরিলেই বুঝা যাইবে। কেবল জ্ঞান-বিতরণ অপেক্ষা শিক্ষকের আরও যে উচ্চতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে, ইহা সাধারণের মত। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অসভ্য, অশান্ত, দাঙ্গাবাজ হইলে সাধারণ লোকে সেই বিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের প্রতিও কতকটা দোষারোপ করে। এ বিষয়ে লোকের মত অভ্রান্ত। সাধারণ লোকে বিদ্যালয়-গমনের ফলস্বরূপ জ্ঞানের উপর আরও কিছু চায়। যতই চিন্তা করা যায়, ততই উপলব্ধি হয় যে, সাধারণের এ প্রত্যাশা নিতান্ত ন্যায়-সঙ্গত। লেকথ এমন মনে করেন না যে সকল সময়েই এ বিষয়ে শিক্ষকের প্রতি সদ্বিচার হয়, অথবা অভিভাবকদিগের প্রত্যাশা সর্ব্বত্রই ন্যায়-সঙ্গত। গৃহ-শিক্ষাই আদি শিক্ষা, সকল শিক্ষককেই এই শিক্ষার উপরে কতকটা নির্ভর করিতে হয়। গৃহ-শিক্ষায় ত্রুটি থাকিলে বিদ্যালয়ে তাহা শীঘ্রই ধরা পড়ে। গৃহ-শিক্ষায় তাচ্ছিল্য থাকিলে বিদ্যালয়ে তাহার সম্যক্ সংশোধন হইবে, এরূপ প্রত্যাশা অসঙ্গত। গৃহে সম্পাদিত কুশিক্ষা অথবা অশিক্ষার ফল বিদ্যালয়ে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, সে দিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এ অবস্থায় শিক্ষকের ঘাড়ে দোষ চাপান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক সে দোষ শিক্ষকের নহে। যাহা হউক, চারিদিকে নানারূপ অসুবিধা থাকিলেও বালকের চলন চরিত্রে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব শিক্ষককেই লইতে হয়।

শিক্ষা-দানের সঙ্গে সঙ্গে এই তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া শিক্ষক পরিবারের এবং রাজ্যের যে উপকার করেন, তাহার অধিক উপকার তাঁহা হইতে সম্ভবে না। শিক্ষকের কার্য্য একদিকে অতি সামান্য বলিয়া মনে করিলেও এই গুরুতর কার্য্যটি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীতে বালকের যথোচিত আচরণ-শিক্ষা একটি উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বালকের উপরে পিতা মাতা অপেক্ষা রাজ্য-শক্তির দাবি অধিক, প্লেটোর এই মত বর্ত্তমান সভ্যতা অতি ধীরতার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিলে যে জাতীয় জীবনের একতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ থাকে, তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। নাগরিকদিগের সাধুতার উপরে যে রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করে, যে উন্নত উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্পে চালিত হইয়া সক্রেটিস্ এবং প্লেটো একথা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমরা বুঝি। এ বিষয়ে আমরা মূল ভাবটি এই পাইতেছি যে,

চরিত্রের সাধুতাই জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রলোভনের সঙ্গে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে এবং সর্ব্ববিধ আপদ বিপদে সাধুতার অনুসরণ করিতে বালককে সাহায্য করিয়া, তাহার সাধু-চরিত্র-গঠনের জন্য শিক্ষক যখন পরিশ্রম করেন, তখন বুঝিতে হইবে তিনি অতি মহৎ ফল লক্ষ্য করিয়াই খাটিতেছেন।

সৌভাগ্যক্রমে স্কটলণ্ডে যে বাধ্যকরী * শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর একটি কথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন। দেশের সমস্ত বালককে প্রাথমিক শিক্ষায় বাধ্য করিবার ভার রাজ-শক্তি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের যে একটি বিশাল বিপদ দেখিয়া রাজনীতিবিৎ, সমাজনীতিবিৎ এবং নরহিতৈষী মাত্রেই বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন, তাহা দমন করিবার উদ্দেশ্যেই এ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে পাপ এবং দুশ্চরিত্রতা যেরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তাহারই প্রতিকারের উপায়স্বরূপ এই বাধ্যকরী শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ভাল লেখা, ভাল পড়া এবং ভাল অঙ্ক কসায় আনন্দ দুষ্কার্য্যের প্রলোভনকে দমন করিতে পারিবে, এমন কথা কোন রাজ-নীতিজ্ঞ— কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন না। জ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ নীতি-শিক্ষা এবং তৎসঙ্গে আর যাহা কিছু শিক্ষকের কর্ত্তব্য, তাহা হইতেই সাধারণে এই অনিষ্ট-প্রতিকারের আশা করিতেছে। দেশ শুদ্ধ লোক যদি এই আশায় বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহারা এই জটিল ও ব্যয়-সঙ্কুল-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার সময়ে যে উচ্চতর ফলের প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাহাই হারাইল। এই প্রণালী অধ্যাপন-ব্যবসায়কে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূমিতে স্থাপন করিয়াছে, ইহা একটি লাভ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকদিগের উপরে অধিকতর বিস্তৃত এবং অধিকতর পরিদৃশ্যমান দায়িত্ব ও অর্পণ করিয়াছে। ভবিষ্যতে দেশে জাতীয় নৈতিক চরিত্র যেরূপ দাঁড়াইবে, তদ্দ্বারাই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর কৃতকার্য্যতার পরীক্ষা হইবে। বালকদিগের স্মৃতিভাণ্ডার যে কেবল মুখস্থ জ্ঞানে পূর্ণ হইবে, দেশ তাহা চায় না; দেশ চায়, সেই সঙ্গে বালকের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত এবং সদভ্যাস গঠিত হইবে, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এইগুলিই তাহার মূলধনের কার্য্য করিবে। যে আধুনিক সভ্যতা তীব্র প্রতিযোগিতা, স্বার্থসংঘর্ষ, জন-কোলাহল এবং উত্তেজনা-লালসা হইতে সমুৎপন্ন, তাহার নীতি-শীলতার হ্রাসই প্রধান চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সহরের সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিলেই ইহা আমাদের চক্ষে পড়ে। এই সকল গৃহস্তূপের মধ্যে দরিদ্রতা অপেক্ষা পাপই অধিক পরিমাণে মানবের দুর্দ্দশা ঘোষণা করে। বহুসংখ্যক শিশু সন্তানেরই এই সকল মানব-দুর্দ্দশার আশ্রম ছাড়া অন্য ঘর বাড়ী নাই। যে

* সংপ্রতি ইংলণ্ডেও এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সন্তানকে শিক্ষা দিতে ইহা দ্বারা সকলেই বাধ্য।

অনুবাদক।

গৃহানুরাগের তুলনা মিলে না, এই সকল হতভাগ্য তাহা জানেও না। অতি শৈশব হইতেই তাহাদের জীবন কঠোর এবং কঠোরকর হইয়া থাকে। তাহাদের সুখ এবং সম্ভ্রমের সম্ভাবনা অতি অল্প। দেশের জন-সাধারণের ইচ্ছা, দয়া-চালিত সুকৌশল-যুক্ত শিক্ষা ইহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক, সুখ এবং সম্ভ্রমের সম্ভাবনাটা অন্ততঃ ইহাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত হউক। প্রধানতঃ এই সকল শিশু সন্তানেরর জন্যই বাধ্যকরী শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত। অন্তবিধ অবস্থার নিম্নশ্রেণীর সন্তান-শিক্ষার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিন্তু নব-প্রবর্ত্তিত উন্নত এবং দায়িত্বযুক্ত প্রণালীর ফল ঐ শ্রেণীর সন্তানেরাও ভোগ করিতে পাইবে। পিতা মাতার অবহেলা এবং দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন যে সকল শিশুর শিক্ষা হয় না, তাহাদের শিক্ষার জন্য এখন বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই নূতন প্রণালীর উদ্ভাবনে সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে শিশুদিগের এবং সকল শ্রেণীর সকল লোকেরই উপকার হইবে। পিতা মাতা, শিক্ষা সমিতির সভ্যগণ, শিক্ষক ও শিক্ষা-বিভাগ-সংসৃষ্ট রাজ-কর্ম্মচারিগণ এবং জন-সাধারণ, সকলেই ইচ্ছা করেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তৃত-ভাবে প্রদত্ত হউক। সমিতির সভ্যগণ এবং শিক্ষকদিগের মধ্যে হৃদ্গত যোগ এবং বুঝিয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেই এ প্রণালী কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আচরণ-শিক্ষা এবং জ্ঞান-শিক্ষা, এই উভয়ই যে শিক্ষা-প্রণালীর উদ্দেশ্য, তাহা আমাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল বালকের বাড়ীতে সুশিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, বরং কুশিক্ষাই হইয়া থাকে, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যাহা হউক, শিক্ষকের প্রতি এ শিক্ষার ভার দেওয়া অসঙ্গত নহে, বরং বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইহাই প্রধান ভার এবং শিক্ষকেরা ইহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

অনেকে এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে, শিক্ষকদিগের যাহা ন্যায্য কর্ত্তব্য, এ ভার তদতিরিক্ত। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, বরং সাধারণ শিক্ষার মধ্যেই ইহা নিহিত রহিয়াছে। সততা, সত্য-বাদিতা এবং আত্মসংযম বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যেমন, সংসারের বিষয়-কার্য্যেও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। শিক্ষক যদি কেবল বিশেষ বিশেষ ঘটনায় নিজের কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বদা সদাচরণের জন্য বল প্রয়োগ করিয়া শিক্ষককে আপন কার্য্যে ব্যাহত হইতে হয় না, বালকেরা আপনা হইতেই সদাচরণ করে। শিক্ষা-কার্য্যে কৃত-কার্য্যতা লাভ করিতে হইলে এমন করিতে হইবে, যাহাতে বালকদিগের মধ্যে দিন দিন নৈতিক চরিত্র বর্দ্ধিত হইতে পারে। যদি কেবল বল বা কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়া অথবা পুরস্কার অর্থাৎ উৎকোচ দিয়া বালকের নিকট হইতে সদাচার আদায় করিতে হয়, তাহা হইলে সে সদাচারের কোন মূল্য নাই। সদাচার যে ভাল, তাহা বুঝিয়া বালকেরা আপনা হইতে তাহার প্রশংসা করিবে এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই সেইরূপ আচরণ করিবে, অতুবা ইহার জন্য শিক্ষকের অনেক সময় এবং শক্তি নিরর্থক

ব্যয় হয়। বালকের চরিত্রকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তাহার উপর শিক্ষকের যত্ন প্রয়োগ করিলে তবে তাহা সফল হয়, কিন্তু সেই ভিত্তির অভাব হইলে শিক্ষা-বিষয়ক সকল প্রকার উপায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে। অতএব শিক্ষার প্রথমাবস্থায় বালকের আত্ম-সংযমের অভ্যাস জন্মাইবার জন্য যদি প্রচুর সময়-ব্যয় হয়, তাহা হইলে অনেক কায হইয়া থাকে। ইহার জন্য সময়ে সময়ে কৌশল পূর্ব্বক বৈচিত্রময় এবং প্রীতিকর উপায় সকল অবলম্বিত হইতে পারে; কিন্তু যেরূপেই হউক কাযটা হওয়া চাই। এই আত্ম-সংযম-শিক্ষা যত অল্প বয়সে আরম্ভ হয় ততই সহজ; বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রথমাবস্থায় এই শিক্ষা যত ভালরূপে হয়, পরবর্ত্তী কালে ততই শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু শিক্ষক-চরিত্রের প্রভাব যে ছাত্র-চরিত্রে প্রতিফলিত, শিক্ষার সর্ব্বাবস্থাতেই শিক্ষককে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। পরিণত বয়সে প্রকৃত বিদ্যানুরাগে যাহারা শিক্ষার্থ উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান এবং নীতি উভয়েরই ভিত্তি পত্তন হইয়াছে, এমন আশা করা যায়; কিন্তু তখনও ছাত্রদিগকে ব্যবহার দ্বারা বুঝাইতে হইবে যে, শিক্ষক তাহাদের চরিত্রের উপরে নির্ভর করেন এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্র যে গঠিত হইয়াছে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন; এরূপ না করিলে ছাত্রদিগের জন্য যাহা যত দূর করা উচিত, শিক্ষক তাহা ততদূর করিতে পারেন না।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা স্বীকার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, অধ্যাপকের পক্ষে নৈতিক চরিত্র-বল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিজের যেরূপ চরিত্র, তদনুসারেই শিক্ষক ছাত্র-চরিত্রে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। শিক্ষক ছাত্রকে আপনা অপেক্ষা উচ্চ করিতে পারেন না, অথবা যে উন্নত অবস্থায় স্বয়ং উঠিতে যত্ন করিতেছেন না, সে উন্নত অবস্থায় ছাত্রকে তুলিতে পারেন না। অধ্যাপনায় কৃতকার্য্যতার যত প্রকার উপকরণ আছে, তন্মধ্যে শিক্ষকের উন্নত নৈতিক চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

প্রথম অধ্যায়।

আত্ম-সংযম।

অধ্যাপনে কৃতকার্য্যতা-লাভের প্রথম প্রয়োজন আত্ম-সংযম। অতি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে শাসন করিতে গেলেও আপনাকে শাসন করিতে হয়। অন্যকে চালাইতে গেলে নিজের শক্তি-নিচয়ের উপর প্রভুত্ব থাকা চাই। সংসারের সকল ব্যাপারেই এ নিয়ম অপরিহার্য্য। যে কোন ব্যবসায়ে হউক, ইহা না থাকিলে কৃতকার্য্যতা অসম্ভব। এই গুণ থাকিলেই চিকিৎসক রোগীকে আপন বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্পূর্ণ উপকৃত করিতে পারেন। কিছুমাত্র বাগ্মিতা থাকিলেই কেবল এই গুণ দ্বারা বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিতে পারেন। এই গুণ না থাকিলে অন্য কোন গুণ দ্বারাই শিক্ষক ছাত্রমণ্ডলীতে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন না। একটি শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলেও আত্ম সংযমের

প্রয়োজন; একত্র অনেকটি শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে এই শক্তির কত যে প্রয়োজন তাহাত বলিয়াই শেষ করা যায় না।

ছাত্রেরা এ বিষয়ে কি মনে করে, তাহাও দেখা যাউক। নিতান্ত শিশু যাহারা, তাহাদিগের পর্য্যবেক্ষা অত্যন্ত প্রবল। এই পর্য্যবেক্ষা দ্বারা চালিত হইয়া, শিক্ষকের নিজের আত্ম-সংযমে শক্তি কত দূর আছে, তাহা তাহারা বুঝিয়া লয়। এই করিয়া তাহারা, শিক্ষকে যে পরিমাণে আত্ম-সংযম আছে, কেবল সেই পরিমাণ শাসনেই নিরাপত্তিতে বাধ্য থাকে। বালকেরা স্বাধীনতা ভাল বাসে, যে কোন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আমোদ করিতে ভাল বাসে, সুতসাং শিক্ষকের মধ্যে কোন বিষয়ে আত্ম সংযমের ক্রটি, শাসনের শৈথিল্য, অথবা পর্য্যবেক্ষার অভাব দেখিলে তাহাই ধরিয়া বসে। এই সকল লক্ষণ সর্ব্বত্রই একরূপ, সুতরাং উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যিনি অধ্যাপনে কৃতকার্য্য হইতে চাহেন, তাঁহাকে এই গুলি স্বীকার করিয়া আমোদে যোগ দিতে হইবে, এবং এই আত্ম-পরীক্ষায় বিচলিত না হইয়া, এই অভিজ্ঞতা যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার সাহায্য করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবেন। বালকদিগের চঞ্চলতা অনিবার্য্য; তাহাদের আমোদপ্রিয়তা অনেক সময়ে শিক্ষা-কার্য্যের নীরস একতানতার লাঘব করে। এই কথা গুলি মনে রাখিতে হইবে, অথচ তাহাদিগকে শাসন করিতে হইবে। যিনি সহজে এবং সুবিবেচনার সহিত বালকদিগকে শাসন করিতে চাহেন, তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া চলিতে হইবে; মিলিয়া চলিতে হইলেই মনের প্রসন্নতা রক্ষা করিতে হইবে, কোপনতা ছাড়িতে হইবে।

বিদ্যালয়ের শাসনে ন্যায়পরতা রাজত্ব করিবে। বালকেরা তাহা বুঝিবে, এবং বুঝিয়া তাহার সম্মান করিবে। এরূপ করিতে হইলে শিক্ষকের পক্ষে আত্ম-সংযম অপরিহার্য্য। আত্ম-সংযমে ক্রটি থাকিলে দেখিতে দেখিতে ছাত্র-শাসনের মূলভিত্তি পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিবে। আত্মসংযমের অভাব ঘটিলে ছাত্রদিগের শাসনে অবিচার ঘটিতে থাকিবে; এই অবিচার ছাত্রদিগের সুসংযম যেমন নষ্ট করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। অন্যায়দর্শনে স্বভাবতঃ যে ক্রোধের উদয় হয়, ছাত্রদিগের হৃদয়ে তাহা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়-পরিচালনে যত প্রতিবন্ধক আছে, তন্মধ্যে এই আত্ম সংযমের অভাবই সর্ব্ব প্রধান। শাসন-শক্তির সঙ্গে ন্যায়-বুদ্ধির বিরোধে কেবল বিদ্যালয়ের অমঙ্গল নহে, ইহাতে রাজ্যেরও অমঙ্গল *। ইহা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার বা শান্তির কত বিরোধী, তহা সহজেই বুঝা যায়। যিনি অধ্যাপনার কিছুমাত্র সংবাদ রাখেন, তিনিই ইহা বুঝিতে পারিবেন। কোন কোন বালক শিক্ষকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে, পাঠে অমনোযোগ লক্ষিত হইতে থাকে। শিক্ষক অস্থির হইয়া পড়েন, এবং একটি একটি করিয়া বালকদিগকে শাসাইতে আরম্ভ করেন; তিনি আগে কঠোর শাসনের ভয় দেখান, শেষটা ক্রোধে আপন অবস্থা বিস্মৃত হইয়া কতকগুলি বালককে প্রহার

* ভারতের রাজ-জাতীয় শাসক, শিক্ষক এবং সম্পাদক মহাশয়েরা ভরসা করি এ কথাটা না বুঝেন এমন নহে।

অনুবাদক।

করেন। প্রথমতঃ টেবিলে ঘন ঘন বেত্রাঘাত করিয়া তিনি শ্রোতাদিগকে কাঁপাইতে ছিলেন। তাহার পরে সেই বেত্র দ্বারা এমন অসতর্কভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন যে, সকলেই আপন আপন পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনেক সময়ে এই অবস্থায় এমন ঘটে যে, বালকেরা নিজের দোষে নহে, কিন্তু শিক্ষকের আত্ম-সংযম না থাকায় দণ্ডিত হয়। লেখক নিজেও এই অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন, তাই এদৃশ্য এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে পারিতেছেন; আত্ম-সংযম-লাভের অগ্নি-পরীক্ষায় যাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহাদিগের কোন রূপ সাহায্য হইতে পারে, এই আশাতেই কথা গুলি বিস্তার করিয়া লিখিলেন। কোনরূপ স্নায়বিক উত্তেজনা কখনও ঘটিবে না, শিক্ষকের পক্ষে এরূপ স্থৈর্য্য লাভ অসম্ভব; কিন্তু ক্রোধ উপস্থিত না হইলে সেরূপ স্থৈর্য্য থাকে, এবং যে অবস্থায় চারিদিক্ বিবেচনা করিতে পারা যায়, সে রূপ স্থৈর্য্য তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে।

অন্যান্য ব্যাপারে যে রূপ, এ বিষয়ে ও সেই রূপ প্রথম অভিজ্ঞতা লাভে কষ্ট আছে। নূতন অধ্যাপনার্থীকে এজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বালকও যাহাতে কষ্ট-ভোগ না করে, পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া তাহা করিতে হইবে। আত্ম-সংযমে অনভ্যস্ত অবস্থায় কতকগুলি বালককে জ্ঞান শিক্ষা দিতে এবং তাহাদের আচরণ সংযত করিতে বাধ্য হওয়া বড়ই কঠিন, সন্দেহ নাই। ব্যাপারটা যে কঠিন তাহা সকলেই জানে, সুতরাং অধ্যাপকতার প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতার প্রত্যাশা কেহই করে না। অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় শিক্ষকতাতেও খাটিতে খাটিতেই উন্নতি হয়। শিক্ষকের পক্ষে দূরদর্শিতার প্রয়োজন, আবার বিদ্যালয়ের মধ্যেই তাহা লাভ করিতে হইবে। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র অভিজ্ঞতা জন্মে, এই উদ্দেশ্যে পর্য্যবেক্ষা এবং কৌশল সহকারে নূতন নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া অভিলষিত ফল প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। পুস্তক অধ্যয়নে যতই উপকার হউক না কেন, এই অভিজ্ঞতা লাভ-সম্বন্ধে তাহা প্রচুর নহে। কোন বিষয় আলোচনার জন্য উপস্থিত করিলে যাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা তিনি সেইরূপ মত প্রকাশ করেন এবং ইহাতে বিশেষ উপকার হয় বটে, কিন্তু ইহাতে শিক্ষকের প্রকৃত কার্য্যের সাহায্য কিছুই হয় না। যতই শক্ত হউক, তাঁহার আপন কায আপনাকেই করিতে হইবে, হয়ত কতক গুলি দুষ্ট প্রকৃতির ছাত্রকে লইয়া তাঁহাকে কখন কৃতকার্য্যতা এবং কখন অকৃতকার্য্যতার মধ্য দিয়া চলিতে হইবে; যখন যাহাতে অকৃতকার্য্য হইবেন তখন তাহা ভবিষ্যতের জন্য অভিনিবেশ সহকারে স্মরণ রাখিবেন, যখন কৃতকার্য্য হইবেন তখন উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবেন। একেবারে নহে, কিন্তু অল্পে অল্পে অধ্যাপনে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে। যখন ভাবের পরিবর্ত্তে বুদ্ধি, ক্রোধের পরিবর্ত্তে ন্যায়পরতা এবং বলের পরিবর্ত্তে দয়া বিদ্যালয়কে নিয়মিত করিবে, তখনই শিক্ষা-কার্য্যে প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বালকের সন্তোষ অসন্তোষ অনুসারে নহে, কিন্তু এই সকল লক্ষণ দ্বারা শিক্ষক বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার কার্য্য আদর্শের কতটা নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই আদর্শ যত উন্নত এবং আদর্শমতে চলিবার জন্য শিক্ষকের প্রতিজ্ঞা যত দৃঢ়, সেই পরিমাণে প্রত্যহ নূতন নূতন আনন্দ জন্মিতে থাকিবে। তিনি যে সময়ে সময়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে, বালকদিগের অসন্তোষ যাহাতে তাহাদের মনে না থাকে তাহাও করিতে হইবে, এবং নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা ক্রোধাদির উপর জয় লাভ করিতে হইবে।

যে সকল অবস্থা কৃতকার্য্যতার প্রতিকূল অথচ অনিবার্য্য, সুতরাং ছাড়াইবার উপায় নাই, তাহা অবগত হইতে হইবে। চিত্তের স্থিরতার পক্ষে বিদ্যালয়ের গোলমাল অনুকূল নহে, কিন্তু তাহা অনিবার্য্য। এমন অনেক অবস্থা আছে, যাহাতে মানুষ সহজেই স্থৈর্য্য লাভ করে; কিন্তু শিক্ষকের অবস্থা তাঁহাকে স্থৈর্য্য উপভোগ করিতে দেয় না, অথচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে স্থির না হইলে চলে না। কোন গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিবার সময়ে ধীরতার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। তাঁহার পক্ষে উপদ্রবশূন্য হইবার আশা যেমন, সমস্ত জটিল বিষয় আপনা হইতে সরল হইয়া যাউক, এ আশাও সেইরূপ। একটি বালকের পড়া শুনিতে শুনিতে চতুর্দ্দিকে শত বালককে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, প্রত্যেক গতিবিধির জন্য চক্ষু এবং প্রত্যেক শব্দের জন্য কর্ণকে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, অথচ বিদ্যালয়ের কার্য্য যাহাতে অবাধে চলে, তাহা করিতে হইবে।

শিক্ষকের অবস্থান ভেদে তাঁহার কার্য্যের কাঠিন্যেরও ন্যূনাধিক্য হয়। শিক্ষক কোন অবস্থাতেই ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণ সুস্থির করিতে পারেন না। কোন বিদ্যালয়েই সকল বালক এক প্রকৃতির হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিলেও ছাত্রের সংখ্যা এবং গৃহ-শিক্ষার ক্রটি যে পরিমাণে অধিক হয়, অধ্যাপনা সেই পরিমাণে দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়। দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের শাসনে অভ্যস্ত ত্রিশটি বালক যে শ্রেণীতে পড়ে, সেই শ্রেণীতে পড়াইতে যে পরিমাণ আত্ম-সংযমের প্রয়োজন, ন্যূনা শ্রেণীর দুই তিন শত শিশুকে পড়াইতে সে পরিমাণ আত্ম-সংযমে কিছুতেই চলে না। এস্থলে পর্য্যবেক্ষা এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা খুব অধিক পরিমাণে থাকা চাই; এস্থলে মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুর শক্তি অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হওয়াতে উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষকতায় যে বিদ্যা লাগে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় তদপেক্ষা অনেক অল্প বিদ্যাতেও চলিতে পারে; কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক অপেক্ষা প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষককে অনেক অধিক পরিমাণে নৈতিক শক্তি, ব্যবস্থা ক্ষমতা এবং পরিচালন ক্ষমতা খাটাইতে হয়। শিক্ষা-সমিতিদিগের জানা উচিত এবং শিক্ষকদিগের ও আত্ম-শক্তি বিচারে মনে রাখা উচিত যে, প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ের অধ্যাপনে যে শক্তির খুব অধিক পরিমাণে প্রয়োজন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপনে তদপেক্ষা ভিন্ন শক্তির খুব অধিক পরিমাণে প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রেই গুণের উপযুক্ত পুরস্কার হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদ্যার সঙ্গে পরিচালন-ক্ষমতার ও বিচার

করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিতে হইবে, কারণ এই ক্ষমতার অভাবে হাজার বিদ্যাতেও কায হয় না।

কোন কোন বালকের মানসিক অবস্থায় বিশেষত্বের কিছু বাড়াবাড়ি থাকে, সেজন্ত শিক্ষককে বড় ভুগিতে হয়। এই বিশেষত্বের জন্ত নানা অসুবিধা উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালন এবং শিক্ষকের আত্ম-সংযমে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। সকল বালকের শাসন এক প্রণালীতে হইতে পারে না; যে বালকের ভাববৃত্তি এবং ঝোঁক বা কোন বিষয়ে মানসিক স্বাভাবিক গতি যত অধিক, তাহার শাসনে তত অধিক বিবেচনার প্রয়োজন। সকলকে এক দরে না ফেলিয়া এই বিশেষত্ব বিবেচনা করিয়া যদি চলিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষকের আত্ম-সংযমে আরও অধিক ভার আসিয়া চাপে। যে সময়ে বিশেষত্ব মানিয়া চলিলে বিশেষ অসুবিধা হয়, বালকেরা ঠিক সেই সময়েই আপনার বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়া বসিবে। যখন এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে, তখন ধমক দিয়া কায সারিলে চলিবে না। এ অবস্থায় বিশেষ চিন্তার সহিত কায না করিলে ফল পাওয়া যাইবে না। তাড়াতাড়িতে হয়ত ঘোর অনিষ্ট হইতে পারে; এ রকম বিষয়ে যখনই খুব কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়, তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য করিলে ক্রমে অধ্যাপন-কার্য্যে নৈপুণ্য বর্দ্ধিত হইবে। বিনম্র চরিত্রের শাসনে যত বিবেচনার প্রয়োজন, উদ্ধত-স্বভাবের শাসনে তদপেক্ষা অধিক বিবেচনার প্রয়োজন। একটি অবাধ্য-বালককে শাসন করিতে এবং তাহাকে আত্ম-সংযম শিক্ষা দিতে শিক্ষকের যতদূর শক্তির প্রয়োজন হয়, দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া অনেকগুলি বিনীত বালকের শিক্ষা দানেও ততদূর শক্তির প্রয়োজন হয় না। এইরূপ বিশেষত্ব যত বালকেরই থাকুক, ইহাদের শাসনে শিক্ষকের আত্মসংযমই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। বিনীতস্বভাব বালকদিগের শিক্ষায় এই আত্ম-সংযম কেবল আংশিকভাবে নিষ্পন্ন হয় মাত্র। অধ্যাপন নৈপুণ্যে কতদূর উন্নতি হইতেছে, তাহা পরীক্ষার্থ শিক্ষকের সময়ে সময়ে কঠিন কঠিন সমস্যা গ্রহণ করা উচিত। নিপুণতার সহিত এক একটি সমস্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ইহাতে শিক্ষকের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। শিক্ষক একটি সমস্যায় জয়লাভ করিলে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালকে তাহাতে উপকৃত হয়; শিক্ষকের শাসনে বালকদিগের বশ্যতা সহজ হয়, আর সকলেরই ভাবি মঙ্গলার্থ শিক্ষকের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একপক্ষে ধরিতে গেলে এরূপ কঠিন সমস্যা গুলি বিশেষ উপকারী; লেখক বিশ্বাস করেন, যে সকল খারাপ বালক এই সকল সমস্যার কর্ত্তা, ভবিষ্যতে তাহারা অতি উৎকৃষ্ট লোক হয়। চিকিৎসক যেমন অত্যন্ত কঠিন রোগে তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তিকে নিবিষ্ট করেন এবং রোগীকে সুস্থ করিতে পারিলে আনন্দিত হন, ব্যবহার-জীবী যেমন জটিল মোকদ্দমা হাতে লইয়া তাহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হন এবং প্রবল যুক্তি গুলি একত্র সাজাইয়া উপস্থিত করেন;

ধর্ম্ম-প্রচারক যেমন সন্দেহ-পীড়িত ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহার অন্ধকার মনে আলোক আনয়ন করেন সেইরূপ যিনি প্রকৃত শিক্ষক, তিনি ক্রুদ্ধ এবং শাসনে অবাধ্য বালককে শান্ত ও বশতাপন্ন করিতে পারিলে বিশেষ আনন্দিত হন। যে বালকের ক্রোধ অন্য কোন বালক সামান্য কিছু করিলেই জ্বলিয়া উঠে, যে বালক আপনার প্রতি শিক্ষকের কোন সন্দেহ দূর করিবার জন্য অক্ষুব্ধ-চিত্তে মিথ্যার পর মিথ্যা বলিয়া যায়, যে বালক সুযোগ পাইলে তাহার কোন না কোন সহপাঠীকে প্রতারণা করিয়া বসে,—এই সকল বালকের প্রতিই শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে এবং অনেক সময় তিনি নির্জ্জনে তাহাদের বিষয় চিন্তা করিবেন। শারীরিক দণ্ড দানে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, শিক্ষকের কর্ত্তব্য এত সহজ নহে। যেমন সমস্ত রোগের এক অমোঘ ঔষধ নাই, সেইরূপ বালকদিগের সমস্ত দোষ-সংশোধনের একটা অব্যর্থ উপায়ও নাই। অপরাধ দমন করিলেই যথেষ্ট হইল না, কিন্তু মনের যে ভাব হইতে অপরাধের উৎপত্তি, তাহাকে নির্ম্মূল করিয়া তাহার স্থানে সদ্ভাবের সঞ্চার করিতে হইবে। ইহা করিতে বল অপেক্ষা নৈপুণ্যেরই অধিক প্রয়োজন, প্রহার অপেক্ষা চিন্তারই অধিক প্রয়োজন। একজন প্রহার-প্রিয় শিক্ষক সম্বন্ধে একসময়ে জনৈক চতুর ছাত্র বলিয়াছিল, "এ কার্য্য ধান-ঝাড়া কল দিয়াও চলিতে পারে।" চাবুক প্রয়োজনীয় জিনিস বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা চিন্তা স্থানচ্যুত হইতে পারে না। প্রহারে ভয় জন্মে এবং ভয়ে ফলাফল চিন্তার সাহায্য করে সত্য, কিন্তু প্রহার যদি ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে এবং সেই বিষয়ে প্রহারই উপযুক্ত শাস্তি, এমন যদি বুঝিতে পারা যায়, তবেই উপকার টুকু হইতে পারে। ভয়ে ক্রোধ দমিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে তাহার নিবৃত্তি হয় না। খেলা-ভূমির দিকেএকবার দৃষ্টিপাত করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রোধে বক্ষ্যমান মিথ্যাবাক্যকে রসনা হইতে দূর করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে প্রতারণাও শিক্ষা দিতে পারে। ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া যে বালক প্রতারণা হইতে বিরত থাকে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিলে সেই বালক আহ্লাদের সহিত প্রতারণা করিতে পারে। যেখানে ভয়ের রাজত্ব, সেখানে ভীরুতা ও প্রবঞ্চনা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়। কঠোর আত্ম-সংযম, চিন্তা, এবং মন্দ কিসে ভাল হইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য কৌশল পূর্ব্বক অবস্থা বিশেষের সৃষ্টি, ইহা ছাড়া অন্যকে শিক্ষা দিবার সহজ উপায় আর নাই।

আত্মসংযম কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত হইলেই বুঝিতে হইবে, বিদ্যালয়ে অধ্যাপনের কৃতকার্য্যতার প্রধান উপকরণ সংগ্রহ হইল। সময়ে সময়ে গোলযোগ অনুভব করিলেও মোটের উপরে বিদ্যালয়ের শাসন তখন সহজ হইয়া আইসে। শাসন-শক্তি যে নিয়ত সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে, বালকেরা তখন তাহা বুঝিতে পারে, সুতরাং ইচ্ছা পূর্ব্বক সেই শক্তির স্থিরতা পরীক্ষা করিতে আর সাহস পায় না। যিনি ছাত্রদিগের মনে সম্ভ্রম জন্মাইয়া

ছেন, সেই শিক্ষক বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার বিদ্যালয়ের অবস্থা যেরূপ থাকে, আর একজন অপরিচিত শিক্ষক হঠাৎ আসিয়া তাঁহার পদে উপস্থিত হইলে বিদ্যালয়ের যেরূপ অবস্থা হয়, এই দুই অবস্থা তুলনা করিলেই বুঝা যায় প্রভেদ কত। শাসন-দক্ষ পরিচিত শিক্ষক বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার শাসন দক্ষতা তাহাদের মনে জাগরুক থাকে, সুতরাং শাসন সম্বন্ধে তাহারা আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করে। যতই বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক না কেন, আত্ম-সংযম না থাকিলে শিক্ষক কিছুতেই ছাত্রদিগের সম্মান এবং বশ্যতা লাভ করিতে পারিবেন না। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় বিদ্যার প্রতি অতি সামান্য শ্রদ্ধাই থাকে। লেখক বিদ্যালয়ে থাকিতে এ বিষয়ে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার শিক্ষকের বিদ্যাবত্তা, চরিত্র বল এবং শারীরিক শক্তি প্রচুর থাকিলেও তাঁহার মেজাজটা বড় চটা রকমের ছিল। এখনকার সাধারণ মত যে প্রহারের বিরোধী, তিনি তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। কঠোর শাস্তি এবং কর্কশ ব্যবহার যদি বালককে শিক্ষকের উত্তেজনা হইতে বিরত রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বিঘ্নে শান্তি ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই মনই সর্ব্বদা অশান্তিতে পূর্ণ থাকিত। প্রত্যহই বেত্রাঘাত চলিত, অথচ চতুর্দ্দিকে হট্টগোল অবাধে বিরাজ করিত। তাঁহার প্রিয় একটি বেত্র ছিল, উহা তিনি শিরোপরি ঘুরাইয়া সজোরে ছাত্রের পৃষ্ঠে আঘাত করিতেন। ঐ বেত্রটি আর কিছুই নহে, একটি চামড়ার কোমরবন্ধ। বিদ্যালয়ের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যহ গোলমাল আরম্ভ হইত। ক্রোধে শিক্ষকের চক্ষু ঘূর্ণিত, তাঁহার কম্পিত হস্ত সেই কোমরবন্ধ ধরিত। হয়ত এমন সময়ে কোন ছাত্র একটি ক্ষুদ্র অপরাধ করিল; অন্য হইলে এজন্য একটা ধমকই হয়ত যথেষ্ট মনে করিত, কিন্তু ইনি অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন না। সেই বালকের সেই ক্ষুদ্র অপরাধ উপলক্ষ করিয়া সকলেই গোলমাল করিয়া উঠিল, তখন আর যায় কোথায়? সেই কোমরবন্ধের সপাসপ আঘাত সকলেরই ভাগ্যে ঘটিতে লাগিল। অনেক বালকই ইহাতে ভয় এবং আমোদ পাইত,—ভয় প্রহারে এবং আমোদ গোলমালে। এরূপ অবস্থায় শাসন অসম্ভব। আরও বিপদ হইল। শিক্ষক অনেক সময়ে নিরপরাধকেও প্রহার করিতেন। শাসনে ন্যায়পরতা দেখিতে সকলেই ভাল বাসে। সুতরাং সকলেরই দণ্ডিত বালকের প্রতি সহানুভূতি এবং শিক্ষকের প্রতি শত্রুতা হইতে লাগিল। একদিন সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী একটী বালক শিক্ষককে একখান পুস্তক ছুড়িয়া মারে। ক্রোধোন্মত্ত শিক্ষক একটি বালককে ধরিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বালক অপরাধী নহে। বিশৃঙ্খলার চরম অবস্থা উপস্থিত হইল। যে বালক প্রকৃত দোষী, সে সর্ব্ব-সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার চেহারা হইতে ঘৃণা যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল, এবং সে চীৎকার

করিয়া বলিল, "উহাকে প্রহার করেন কেন? ও কিছুই করে নাই, আমিই বই ছুড়িয়া ছিলাম।" ইহা শুনিয়া শিক্ষক সেই দোষী বালককে প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইত্যবসরে রীতিমত একটা দাঙ্গা বাধিয়া গেল; ইহাতে শিক্ষক শারীরিক বলে যদিও পরাস্ত হইলেন না, কিন্তু তিনি নৈতিক বলে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেন। এই অবস্থায় অধ্যাপন অসম্ভব সুতরাং শীঘ্রই তাহার শেষ হইল। এই শিক্ষক অধ্যাপন ছাড়িয়া অন্য এক ব্যবসায় অবলম্বন করতঃ তাহাতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাহিরের লোকে যে সকল গোলযোগ কল্পনাও করিতে পারে না, কেবল আত্ম-সংযমের বলেই শিক্ষক সে সকল গোলযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে আত্ম-সংযম-শূন্য ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদের স্থান। যাহাতে যথেষ্ট আনন্দ আছে, প্রচুর উৎসাহও পাওয়া যায়, শিক্ষকতার ন্যায় এমন গুরুতর প্রয়োজনীয় অতি অল্প ব্যবসায়ই আছে, কিন্তু চাই অন্যকে শাসন করিবার কৌশলটা জানা থাকা। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তন্মধ্যে আত্ম-সংযমই যে সর্ব্বপ্রধান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিদ্যালয়ের শাসন।

আত্ম-সংযমের পরেই ছাত্র-শাসন সম্বন্ধে কথা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। শিক্ষকের পক্ষে আত্ম-সংযম একটি সর্ব্ববাদি সম্মত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। শিক্ষক আপনাকে শাসন করেন, কেননা তাহা হইলে তিনি অপরকে ভালরূপে শাসন করিতে পারেন। বিদ্যালয়ের শাসনে প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটে, এ স্থলে তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। বিদ্যালয়ের শাসনের উদ্দেশ্য দুইটি, জ্ঞান-শিক্ষা এবং আচরণ-শিক্ষা। বিদ্যালয়ের সকল প্রকার পরিচালনেই এই দুই বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য।

শাসনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে বালকদিগের প্রকৃতির সঙ্গে মিল রাখা চাই। তাহাদের বুদ্ধি কিরূপ, কখন কি উদ্দেশ্যে তাহাদের বুদ্ধি পরিচালিত এবং আচরণ নিয়মিত হয়, এ সকল বিবেচনা করিতে হইবে। অনেক সময়ে মন্দ উদ্দেশ্যে মন্দ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যাইবে; যাহাতে এ সব না ঘটিতে পারে, তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের শাসন স্বাস্থ্যকর হইতে হইলে এ সমস্তই তাহার অন্তর্ভূত হওয়া চাই। আত্ম সংযম অপেক্ষা এ কার্য্য সহজ নহে। কিন্তু অধ্যাপনে কৃতকার্য্যতা লাভের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। যাঁহারা অধ্যাপনে কৃতকার্য্যতা চাহেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ধৈর্য্য এবং বিবেচনায় বিশেষ অভ্যাস করিতে হইবে।

বালকদিগের পাঠ মুখস্থ করিবার সময়ে যেমন, পাঠ দিবার সময়েও সেইরূপ, বিদ্যালয়ের শাসন সর্ব্বদাই অব্যাহতরূপে চলিবে। শিক্ষা কার্য্যে ইহা গৌণ কর্ম

হইলেও, বিদ্যালয়ের পরিচালন কার্য্যে ইহা আত্যাবশ্যক, সুতরাং বিষয়টা অবহেলা করিলে চলিবে না। বাহিরে দেখিতে আপাততঃ বোধ হয় পড়ানই শিক্ষকের প্রধান কার্য্য; অথচ পড়াইতে পড়াইতেই অস্পষ্টভাবে তাঁহাকে বিদ্যালয়ের শাসন সর্ব্বদা করিতে হয়। এই শাসন-ক্রিয়ার পরিচালন যত অস্পষ্ট হয়, শিক্ষক এবং বালকের পক্ষে ততই মঙ্গল। শাসনটা মুখ্যস্থলে না ধরিয়া গৌণ বলিয়া দেখাইলেই ইহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। শাসনের জন্য শিক্ষা নহে, শিক্ষার জন্যই শাসন। গানের সঙ্গে বাদ্য-যন্ত্র যেরূপ, সেইরূপ শাসন ও শিক্ষার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া ইহার সাহায্য করে। শাসনকে গৌণ-কল্প রাখিলেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট; যাহাতে শিক্ষকের মন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, শাসনের জন্য এমন কোন জটিল ব্যবস্থা কর্ত্তব্য নহে। যে শাসনে যত্ন এবং চিন্তা যত অল্প প্রকাশ পায়, সে শাসন তত সহজে বদ্ধমূল হয়। শাসন একবার বদ্ধ-মূল হইয়া গেলে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের অজ্ঞাতসারেই নীরবে উহা সম্পাদিত হইতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই শাসন সুদৃঢ় করিবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী কি? কি হইলে কতকগুলি বালককে স্ববশে রাখিবার আশা করা যাইতে পারে, শিক্ষককে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। সম্মান এবং বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত যে সকল গুণ বালকেরা ঊর্দ্ধতন ব্যক্তিতে চায়, সে সকল গুণ কি, তাহা জানিতে হইবে। তাহারা কেবল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাতেই সন্তুষ্ট নহে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রকৃত কার্য্যতৎপরতা এবং যথার্থ গভীর সহানুভূতি স্থির এবং ধীরভাবে পরিচালিত হইতে দেখিতে চায়। অবশ্য তাহারা কথায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না যে ইহাই তাহারা চায়, কিন্তু বাস্তবিক বালকেরা ইহারই অন্বেষণ করে। অতএব বালকেরা যুক্তি ও সদ্ভাবের বিরোধী নহে এবং শিক্ষকের নিকট ভাল বলিয়া গণ্য হইতে সর্ব্বদা উৎসুক, শিক্ষকের সর্ব্বদা এই কথাটি মনে রাখিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং তাহাদিগের আচরণ নিয়মিত করিতে হইবে। বহু বালকের মধ্যে শান্তি বজায় রাখিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে শিক্ষককে এ বিষয়টা মনে রাখিতে হইবে।

এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য, যাহা অসম্ভব, শিক্ষক কদাচ তাহার প্রত্যাশা করিবেন না। যতটুকু শান্তি এবং শৃঙ্খলা থাকিলে বিদ্যালয়ের কার্য্য অবাধে চলিতে পারে, তিনি তাহারই প্রত্যাশা করিবেন, এমন প্রত্যাশা করিবেন না যে, বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিবে। বালকেরা স্বভাবতঃ অস্থির, তাহাদের অস্থিরতা সহ্য করিতে হইবে। অস্থিরতা স্বাভাবিক, সুতরাং অস্থিরতাকে শৃঙ্খলা-ভঙ্গের লক্ষণ মনে করা ন্যায় সঙ্গত নহে; এরূপ করিলে বালকের প্রতি অন্যায় করা হয়, বিদ্যালয়ের শাসনেও ব্যাঘাত জন্মে। বালকেরা যে স্বভাবতঃ

[illegible], একথা মনে রাখিয়াই বিদ্যালয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। গ্রীষ্মে অত্যন্ত গরম এবং শীতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে, ঘরের এরূপ বন্দোবস্ত হইলেই বালকেরা বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বালকদিগের অবস্থান এবং পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন করিতে দিলে তাহাতেও শান্তিরক্ষার সাহায্য হয়। এ সকল বিষয়ে কোন নিয়ম অবধারণ করা যায় না। কখন কিরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন, শিক্ষককে তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর লৌহ-যন্ত্রে পড়িয়া বালকদিগের জীবন যাহাতে চূর্ণবিচূর্ণ না হয়, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুগণ পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইলে যদি বিদ্যালয়ের মধ্যে তাহাদিগকে সৈন্যদিগের ন্যায় সমান্তর পাদবিক্ষেপ করিতে দেওয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে তালে তালে কোন বাদ্য-যন্ত্র বাদিত হয়, তাহা হইলে সহজেই তাহাদের ক্লান্তি দূর হয়, গোলমাল থামাইতেও শিক্ষককে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। যে সকল বাহ্য অবস্থা মনঃসংযোগের অনুকূল, শিক্ষাকার্য্যে সে সকল অবস্থার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কিন্তু এই বাহ্য অবস্থা যে মানসিক এবং নৈতিক অনুকূল অবস্থার সোপানস্বরূপ, তাহাও মনে রাখিতে হইবে।

সুশিক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তদনুসারে শিক্ষকের কর্তৃত্বে বশ্যতাই শাসন। এই শাসন শিক্ষকশক্তির সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্তমান থাকিবে, অথচ সর্ব্বদা কথায় কথায় ইহা প্রকাশ পাইবে না। নিঃশব্দ বায়ুরাশি যেমন চারিদিকে বর্তমান থাকিয়া বালকদিগের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেই রূপ এই শাসন শক্তি নিঃশব্দে বর্তমান থাকিয়াই যেন বালকদিগের জীবন গঠনে সাহায্য করে। ফলতঃ মূল কথা এই, বালকেরা মনে মনে বুঝিবে যে তাহারা শাসনে আছে, কিন্তু শিক্ষক মহাশয় যত কম পারেন নিজের শাসন শক্তি প্রকাশ করিবেন।

ছাত্রের আচরণ নিয়মিত করিবার অনেক রূপ উপায় শিক্ষকের হাতে রহিয়াছে। কোন্ অবস্থায় কিরূপ উপায় কি পরিমাণে অবলম্বন করা উচিত, তাহা তিনি বিবেচনা করিয়া লইবেন। বিদ্যালয়ে শান্তি রক্ষা প্রথম কর্তব্য; এজন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তাহাও করিতে হইবে। কেমন করিয়া অভিলষিত ফল পাওয়া যাইবে, তাহাই প্রধান কথা। চক্ষের ভঙ্গীতে, উৎসাহ সূচক বাক্যে, সতর্কতা বা ভৎর্সনা, কিম্বা আদেশ অবহেলা করার অপরাধে শারীরিক দণ্ড— কখন কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এ বিষয়ে তিনি ছাত্রদিগের মত লইয়া কার্য্য করিতে পারেন। শান্তিরক্ষায় সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইতে হইলে কিরূপ উপায় সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ, তাহা সর্ব্বাগ্রে অবধারণ করিতে হইবে। লেখক মনে করেন, ইহা অতি সুন্দররূপেই অবধারণ করা যাইতে পারে। নয়নের ভাব ভঙ্গী শাসন-শক্তির মূল; চক্ষের পরেই বাক্য, অথবা বাক্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ সঙ্কেতাদি; যখন এ সকলে কোন ফল হয় না, যখন একেবারে আর কোন উপায় নাই, কেবল তখনই শারিরীক দণ্ড অনিবার্য্য।

সর্ব্বাগ্রে চক্ষু হইতেই শিক্ষকের প্রভাব প্রবাহিত হয়। ছাত্রেরা একবার বুঝিতে

পারেন যে, শিক্ষকের কথা কর্ণে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারি চক্ষু অপরাধীকে লক্ষ্য করে, তাহা হইলেই তাঁহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। যেরূপ আচরণের শাসন চাই, তাহার উপরে সর্ব্বদা চক্ষু রাখিতে হইবে। যতদূর সম্ভব, বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্য্যই শিক্ষকের চক্ষের সম্মুখে সম্পাদিত হওয়া চাই। এ কথাটি ভুলিয়া যাওয়া অথবা এ বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া গুরুতর দোষ; এজন্য ছাত্রদিগের উপবেশন এমন ভাবে হইবে,যেন সকলের উপর শিক্ষকের দৃষ্টি থাকিতে পারে। যাহাতে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, এমন ভাবে আসন সাজাইলে ইচ্ছা পূর্ব্বক শিক্ষকের শক্তিকে অনেক পরিমাণে নষ্ট করা হয় এবং ছাত্রেরাও সেই পরিমাণে উপকার হইতে বঞ্চিত হয়। শিক্ষকের শক্তি তাঁহার চক্ষুতে যেমন প্রকাশ পায়, অতি বিবেচনার সহিত বাছিয়া বাছিয়া শব্দ ব্যবহার করিলেও তেমন প্রকাশ পায় না। ছাত্রেরা কথা বুঝিবার পূর্ব্বেই চক্ষের ভাব বুঝিতে পারে; লক্ষিত আচরণে সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবার এমন উপযুক্ত যন্ত্রও চক্ষের মত আর কিছু নাই। যে চক্ষের ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া দেখে, সে প্রায়ই তাহার ভাব বুঝিতে পারে। চক্ষের শাসন ক্রিয়া অতি দ্রুতগামী, অথচ নীরবে সম্পাদিত। চক্ষের দৃষ্টি বিদ্যুতের ন্যায় বিদ্যালয়ের সর্ব্বত্র চলে, অথচ ইহা বুঝিতে প্রায়ই ভ্রম হয় না। বাক্য দ্বারা উৎসাহ, ভয়-প্রদর্শন অথবা তিরস্কার প্রকাশ করিতে যে সময় লাগে, চক্ষের দ্বারা তাহা তদপেক্ষা শীঘ্র নিষ্পন্ন হয়, অথচ বিদ্যালয়ের কার্য্যে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। এই সমস্ত দ্বারা শিক্ষকের যে প্রভাব বিস্তার হইবার কথা, চক্ষু দ্বারা শাসন-কার্য্য ছাড়িয়া দিলে তাহার বর্ণনাতীত ক্ষতি হয়। চক্ষের দ্বারা ক্রমে ক্রমে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে একটা অমুক্ত অথচ স্পষ্টানুভূত ভাব জন্মিয়া যায় এবং ইহাতে বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনার বিশেষ সুবিধা হয়। চক্ষের শাসনের আর একটা সুবিধা এই যে, ইহাতে বহু লোকের মধ্যেও কথা গোপন রাখা যায়। তারের সংবাদ প্রেরণে গুপ্ত ভাষা যে কার্য্য হয়, ইহা দ্বারাও সেই কার্য্য হয়, অধিকন্তু শিক্ষা-কার্য্যে বালকের মনে নীরবে যে প্রভাব সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, তাহার তুলনা নাই। সকলের কার্য্য করিতে করিতে আবার ব্যক্তিবিশেষকে মনোভাব জানাইবার প্রয়োজন শিক্ষকের যত হয়,এত আর কাহারও হয় না; আবার অন্যের অজ্ঞাতসারে সেই মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিলে যতটা ফল হয়, ততটা আর কিছুতেই হয় না। কোন প্রকার অসদাচরণের উপক্রমে এইরূপ চক্ষের ইঙ্গিত বিশেষ ফলপ্রদ। কোন বালককে প্রত্যেকবার সকলকে শুনাইয়া শাসন করিলে সে শাসনের ধার যেন কমিয়া যায়। অনেক সময়ে কোন বালকের অপরাধের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে বালক অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন তাহাকে শাসন করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। চক্ষের ইঙ্গিতে সাবধান করিয়া দিলে বালক সংশোধনের সুযোগ পায়, অথচ অন্য বালকদিগের নিকট তাহার আত্ম-সম্মানের খর্ব্বতা হয় না। এই ভাবে উৎসাহ দিলে শিক্ষকের অনুরাগের নিদর্শন পাইয়া বালক আরও উৎসাহিত হয়, অথচ তাহার গর্ব্বিত হইবার কোন কারণ থাকে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, শিক্ষক আপন চক্ষের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত, বিস্তৃত, সদয় এবং উৎসাহ সূচক ভাবে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন। বালকেরা যদি একবার বুঝিতে পারে যে, শিক্ষকের চক্ষুঃ সর্ব্বত্রই যায়, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার ক্ষমতা বুঝিতে পারে এবং আপনা হইতে বাধ্য থাকে।

শাসনের দ্বিতীয় উপায় শিক্ষকের কণ্ঠ-স্বর। শাসনের উদ্দেশ্যে চক্ষের পরিচালনা যত চলে, বাক্যের পরিচালনা তত চলে না। সাধারণতঃ জ্ঞানোপধানেই বাক্যকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। শাসনের জন্য যখন বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে, তখন এমন ভাবে কথা বলিতে হইবে, যেন তাহা হইতে সকলেই উপদেশ পায়। এরূপ করিলে শিক্ষকের বাক্যে সমস্ত বালকেরই আচরণ শিক্ষা হইবে; কিন্তু কথাকে ফলোপধায়িনী করিতে হইলে তাহার ব্যবহার যতদূর সম্ভব অল্প হওয়া চাই। বাক্য যে পরিমাণে অধিক হইবে, সেই পরিমাণে তাহার প্রভাবও প্রকাশিত হইবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। যেমন ছাত্রের পক্ষে অধিক কথা বলা সুসংযমের প্রতিকূল, সেইরূপ শিক্ষকের পক্ষে অধিক কথা বলা সুশাসনের প্রতিকূল। এমন স্থলে কথা বলিতে হইবে, যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে, কথা না বলিয়া উপায় ছিল না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অতি প্রয়োজনীয় উপদেশও বার বার পুনরুক্তিতে অকার্য্যকর হইয়া পড়ে। পুনঃপুনঃ বলাতে উপদেশের উপকারিতা কমিতে থাকে, আবার প্রত্যেকবার যথাশক্তি চীৎকার করিয়া কথা বলিলে ফল আরও ভয়ানক হয়। "সর্ব্বদা অথবা অবিবেচনার সহিত বাক্যের ব্যবহারে শাসন-শক্তিকে যেমন দুর্ব্বল করে, এমন আর কিছুতেই নহে। বজ্রও যদি অনবরত নিনাদিত হয়, তাহা হইলে তাহাও জাঁতার শব্দের ন্যায় ভয়োৎপাদনে অক্ষম হইবে।" কথা ঠিক। সর্ব্বদা ছাত্রের দোষানুসন্ধান করিলে শিক্ষকের নৈতিক প্রভাব বাষ্পের ন্যায় উড়িয়া যাইতে থাকে। সর্ব্বদা উপদিষ্ট হইতে আমরা কেহই ভালবাসি না; বালকদিগের প্রকৃতিও এ বিষয়ে আমাদিগের হইতে পৃথক্ নহে। শিক্ষক একটুকু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, এক ধরণের উপদেশ পুনঃপুনঃ শুনিয়া বিদ্যালয়ের সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠে।

শাসনে শারীরিক দণ্ড সর্ব্বশেষে উল্লেখযোগ্য, এবং ইহার প্রয়োগও যতদূর সম্ভব অল্প হওয়া কর্ত্তব্য। শারীরিক দণ্ডের কথা উল্লেখের অযোগ্য নহে। আর শারীরিক দণ্ড একবারে ছাড়িয়া দিলে শিক্ষক কেমন করিয়া যে কায করিতে পারেন, তাহাও বুঝা যায় না। সকল প্রকার শাসনেই ইচ্ছা পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব অবজ্ঞা করিলে তজ্জন্য শাস্তির বিধান থাকা চাই, নতুবা শাসন অসম্ভব। যাহা হউক, শারীরিক শাস্তির প্রয়োজন স্বীকার করিলেও লেখক আশা করেন, সামান্য অপরাধের জন্য কঠোর ও নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিবার দুর্নাম তাঁহার দেশীয় বিদ্যালয় সকল হইতে দূর হইয়াছে। প্রহারের প্রথায় যে ভাল ফল পাওয়া যাইত, ইহা তিনি অস্বীকার করেন না। লেখক স্বীকার করেন, তিনি নিজে এবং তাঁহার মত আরও অনেকেই ছাত্রাবস্থায় প্রহার হইতে অনেক উপকার পাইয়াছেন। কিন্তু অতি অল্পদিন পূর্ব্বে লেখকের দেশে ছাত্রদিগকে প্রহার করিবার যেরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে শিক্ষা-নৈপুণ্য এবং মানব-প্রকৃতি-সম্বন্ধে

জ্ঞান অতি হীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। সর্ব্বদা ব্যবহারে শাস্তি-প্রদানের প্রচলিত যন্ত্রগুলি দিয়া আর কায হইত না, তখন শিক্ষক অতি লজ্জাকর এবং বিষময় ফলোৎপাদক নূতন নূতন উপায়ের আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অতি লজ্জাকর শাস্তির প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিল। লেখকের স্মরণ আছে, গ্রীষ্মকালে একদিন অনেকগুলি বালক কি গোল'যাগ করিয়াছিল, শিক্ষক তন্মধ্যে একটীকে ধরিয়া আনিলেন, এবং শীতপ্রধানদেশে ঘরের ধূমা বাহির হইবার যে নল থাকে, তাহার ভিতরে সেই বালকের মাথা দিয়া তাহাকে আগুনের নিকট দাঁড় করিয়া রাখিলেন। আরও লজ্জার বিষয়, যে সকল বালক তুল্য অপরাধে অপরাধী, বরং তন্মধ্যে যাহারা অপরাধে অগ্রগামী ছিল, শিক্ষক তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সেই হতভাগ্য বালকের দুরবস্থা দেখাইতে লাগিলেন এবং সে সেই নল হইতে মাথা বাহির করিলে তাহার কালিতে মাখান মুখ দেখিয়া সেই সকল বালক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। এইরূপ শাস্তি এবং তাহার নৈতিক পরিণাম ভাবিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কঠোর বেত্রাঘাতের অবৈধতা সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি কোন শিক্ষক পুস্তক দ্বারা প্রহার করেন অথবা কিল মারেন, তাঁহার এ ব্যবহার সমর্থন করিতে তিনি সক্ষম হইবেন না। যদি হঠাৎ কখনও শিক্ষক পদ উত্তোলন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে এত সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, ভবিষ্যতে আর যাহাতে এরূপ না হয় তজ্জন্য তিনি সাবধান থাকিবেন। পদাঘাত শিক্ষকের পক্ষে শোভা পায় না। উক্ত দেশে ছাত্রের প্রতি প্রহারের বন্দোবস্ত থাকাতে যতই উপকার হইয়া থাকুক, প্রহারের সঙ্গে বিবেচনা এবং ন্যায়পরতার সংস্রব প্রায় ছিলই না। পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকারের ঘটনা যদিও খুব বিরল ছিল, তথাপি অতিশয় প্রহারের প্রথা প্রচলিত থাকাতে অনেক শিক্ষকই যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অপরাধের তুলনায় গুরুতর দণ্ড প্রদান করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্ব্বদা শাস্তি দিতে দিতে শাস্তিদানে শিক্ষকের এক প্রকার অভ্যাস জন্মিয়া যায়। ইহাতে ছাত্রের দণ্ড-সহত্ব বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু ইহাতে সে উন্নত হয় না। লেখকের ছাত্রাবস্থায় জনৈক শিক্ষক সময়ে সময়ে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কি ভাবে সকলকে প্রহার করিতেন, লেখকের সে সকল দুঃখের দিন স্মরণ আছে। ইতিপূর্ব্বে যে একটী ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে, তদ্রূপ এস্থলেও ছাত্রদিগের অবাধ্যতাই ফল হইয়া দাঁড়াইল। ছাত্রেরা ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া তখন সর্ব্বদাই শিক্ষকের আশঙ্কা হইতে লাগিল। এই আশঙ্কা ক্রমে এমন বদ্ধমূল হইল যে, ষড়যন্ত্রকারী কোন বালককে ধরিতে পারিলে তাহাকে বিলক্ষণরূপে প্রহার করিবার মানসে সময়ে সময়ে তিনি বেত্রহস্তে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কিন্তু এরূপ চালাকি বরাবর

সফল হয় না। ক্রমে ছাত্রেরাও সর্ব্বদা শিক্ষককে সন্দেহ করিতে লাগিল। ছাত্রেরা আগে কপাটের ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতরে দৃষ্টি করে, তাহার পরে ঘরে প্রবেশ করে। বাহির হইতে কপাটের আড়ালে শিক্ষকের ছায়া দেখিতে পাইলে ছাত্র জোরে কপাটে ধাক্কা দেয়, শিক্ষক লম্ফ দিয়া সরিয়া পড়েন, সকল বালকে হাসিতে থাকে, এবং অপরাধী বালক উত্তোলিত বেত্রের প্রহার হইতে পালাইবার অবসর পায়। শীঘ্রই অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইল। অনতিবিলম্বে যুদ্ধ-মন্ত্রণার জন্ম সভা আহূত হইল এবং শাসনকর্ত্তা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। মন্ত্রণায় অবধারিত হইল যে, সকলের শত্রুস্বরূপ সেই প্রহার-দণ্ডটিকে হস্তগত করিতে হইবে। সুবিধা দেখিয়া দণ্ডটি গৃহীত এব লুক্কায়িত হইল। দিবাবসানে জয়োল্লাসের সহিত উহা বিদ্যালয়ের বাহিরে নীত হইল। কেমন করিয়া উহার ব্যবস্থা করা যায়, ক্ষণকালের জন্ম এ চিন্তা আসিল। রাস্তা দিয়া একখানি খালি গাড়ি যাইতেছিল, তাহারই মধ্যে উহা নিক্ষিপ্ত হইল। গাড়োয়ান ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিল না, সুতরাং বিনা বাক্য-ব্যয়ে উহা লইয়া চলিয়া গেল। আড্ডায় গিয়া থামিলে অবশ্যই সে এই অভিনব সম্পত্তি দেখিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ইহার অনুসন্ধানের সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া পড়িয়া পাওয়া জিনিস বলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। শাসনদণ্ড হারাইয়া শিক্ষক মহাশয় কিছুদিন বড়ই গোলযোগে পড়িয়াছিলেন; তাহার পরে আর একটি নির্ম্মিত হইয়া আসিল বটে, কিন্তু তিনি উহা তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলেন, সুতরাং প্রয়োজনমত হাতের কাছে না থাকাতে যখন তখন মারিবার সুবিধা রহিল না। কাযেই ছাত্রেরাও অনেকটা বাঁচিয়া গেল। *

এই বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, পূর্ব্ব-প্রচলিত শারীরিক দণ্ডের কঠোরতা এবং সতত প্রয়োগ কতটা আক্ষেপের কারণ ছিল। যাহা হউক, লেখক স্বীকার করেন যে, শিক্ষকের শারীরিক দণ্ড-বিধানে অধিকার থাকা উচিত। বর্ত্তমানকালে অনেকের মত শারীরিক দণ্ডের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং অভিজ্ঞতা ও বিচার শক্তির জন্ম যাঁহাদিগের কথা বিশেষ সম্মানের যোগ্য, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে এই মত পোষণ করেন। লেখক কিন্তু এই মতের পোষণ করিতে অক্ষম। যে আমেরিকায় শিক্ষাসম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, তদ্দারাও এই দণ্ড-বিরোধীদিগের মত সমর্থিত হইতেছে। নিউইয়র্ক নগরের শিক্ষা-বিভাগ নিয়ম করিয়াছেন, "শিক্ষকেরা যেন কখনও বালকদিগের মনোযোগের জন্য তাহাদিগকে ঝাঁকি না দেন, ধাক্কা না মারেন, অথবা অন্য কোনরূপ শারীরিক দণ্ড দান না করেন।" ইহার কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে;—"এই সকল ব্যবহার শারীরিক দণ্ডের সামিল; কেবল দূষনীয় বলিয়া

---

* এই দণ্ড বা বেত্র চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়াই সংগ্রহে বিলম্ব।

অনুবাদক।

নহে, বোর্ড স্পষ্টাক্ষরে ইহা নিষেধ করিয়াছেন।” বাল্টিমোর নগরের কর্তৃপক্ষীয়েরা শারীরিক দণ্ডের সম্পূর্ণ বিরোধী না হইলেও এ বিষয়ে নিউইয়র্কে প্রবর্ত্তিত নিয়মেরই অনুবর্ত্তন করেন। ইহাঁদিগের বিদ্যালয়ের শাসন নিয়মে কেবল একটি মাত্র কথা রহিয়াছে; তাহা এই,—“যতদূর সম্ভব, শারীরিক শাস্তি না দিয়া বিদ্যালয় শাসন করিতে হইবে। যদি কখনও শারীরিক শাস্তি দান একান্ত অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলে স্বয়ং প্রধান শিক্ষক অথবা তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে তদীয় ভারপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক, এতদ্ব্যতীত আর কেহ এই শাস্তি দিতে পারিবেন না।” আমেরিকা ছাড়িয়া প্রুসিয়ার শিক্ষা-বিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে সেখানেও প্রহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দেখা যায়। সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রুসিয়াতে ১৮১৯খৃষ্টাব্দে যে ব্যবস্থা প্রণীত হয় এবং ১৮৩১খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়ার শিক্ষা-প্রণালী পর্য্যালোচনা করতঃ রিপোর্ট করিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভিকটর কুঁজি সেই প্রণালীর যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন, তাহাতে শারীরিক দণ্ড দান-বিষয়ে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

সে কথাগুলি এই,—“যে প্রকার শাস্তিতে মানসিক সম্মানের ভাব দুর্ব্বল করে, তেমন শাস্তি কোন কারণে কেহ দিতে পারিবে না। শারীরিক শাস্তির যখন একান্ত প্রয়োজন হইবে, তখন তাহা নির্দ্দয়ভাবে যেন প্রদত্ত না হয়; আর কোনরূপেই যেন ইহা স্বাস্থ্য এবং লজ্জাশীলতার ক্ষতি না করে।” এই সকল উদ্ধৃত বাক্য পাঠ করিলে সকলেই বুঝিবেন, ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা প্রহার করিবার কুপ্রথা যাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা দূর করিবার জন্য কেমন দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। যে সকল নব্য শিক্ষক বিদ্যালয়ে বালকদিগের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য বড় ব্যস্ত, এই সকল কথা পড়িয়া তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, বিদ্যালয়ের শাসন-কার্য্য যে শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা মানসিক এবং নৈতিক শক্তির উপরে অধিক নির্ভর করে, দীর্ঘকালের বহুদর্শিতা এবং পরিণত বয়সের চিন্তা, এই উভয়েই তাহার প্রমাণ দিতেছে। লেখকের মতে, শারীরিক দণ্ড অনেকগুলি অপরাধে শাসনের অতি উৎকৃষ্ট উপায়; কিন্তু যে সকল গুরুতর অপরাধে শাসনের আর অন্য কোন উপায় নাই, কেবল সেই সকল স্থলেই ইহার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বালকদিগের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্ম-সংযম যত বাড়িতে থাকিবে, ততই এই শাস্তি কমাইতে হইবে। লেখক মনে করেন, এই প্রহারসম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মনে মনে স্থির করিয়া রাখা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত উচিত। বিদ্যালয়ের এই প্রহার-বিভাগে উপস্থিত মত রাগের মাথায় কায করিবার প্রলোভন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং তাহার দ্বার একেবারে রুদ্ধ করাই ভাল। কোন্ বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা কতদূর, তাহা অবধারণ করিবার জন্য একটা সুন্দর উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে; যথা—যে বিদ্যালয়ে শাস্তি যত অল্প, সেই বিদ্যালয়ের শাসন-ব্যবস্থা তত উন্নত। যেখানে শাসনের

অন্তর্বিম্ন ব্যবস্থা কিছুমাত্র নাই, সেখানে শাস্তি তুলিয়া দিলে দীর্ঘকাল চলিতে পারে না, শাসনের অভাবে এত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় যে, তাহা নিবারণের জন্ত শিক্ষককে পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর শাস্তি প্রদান করিতে হয়। শাসন ছাড়িয়া উচ্ছৃঙ্খলতার আনয়ন, আবার সেই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ত কঠোরতর শাস্তি প্রদান, ইহা অপেক্ষা নির্দ্দয়তার কার্য্য আর কি হইতে পারে? এইজন্ত বালকেরাও মৃদুপ্রকৃতি অব্যবস্থিত শিক্ষকের শাসনে সন্তুষ্ট থাকে না; কারণ তাহারা দৃঢ়তাযুক্ত অবিচলিত শাসনপ্রণালীতে অধিক নির্ভর করিতে পারে, আর তাহারা জানে যে, কেবল প্রহার করিবার শক্তিই শাসন শক্তি নহে। বিদ্যালয়ের উন্নতিই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, সেই বিবেকী শিক্ষকের নিকট প্রহার-কার্য্য বাস্তবিকই বড় কষ্টকর।

বিদ্যালয়ে শাস্তি দিবার প্রশস্ত উপায় কি, এ বিষয় অনেক অভিভাবকই বুঝেন না? কি উপায়ে বালকদিগকে শাসন করা উচিত, তাহা অবধারণ করা অপেক্ষা বালকদিগের শাসনসম্বন্ধে শিক্ষকদিগের কার্য্য সমালোচন করা অধিক সহজ। যে সকল স্থলে শারীরিক দণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্যবিধ দণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সকল স্থলেই উন্নতি হইয়াছে, লেখকের সে বিশ্বাস নাই। লেখক বলেন, এখন যদি তাঁহার বাল্যকাল ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান কালের সহজ শাস্তির পরিবর্ত্তে পূর্ব্বকার কঠোর দণ্ডই পছন্দ করিতেন। যাঁহারা এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, শিক্ষাকার্য্যে তাঁহাদের বিজ্ঞতায় লেখকের সন্দেহ। পড়া প্রস্তুত না করা অথবা কোনরূপ পালনে অবহেলার অপরাধে পাঠ-লেখার শাস্তি অনেকে দেন; লেখক তাঁহার মত-সমর্থনের জন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি একবার এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকালমধ্যেই উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শাস্তি যে রকমেরই হউক না কেন, তাহা অপ্রীতিকর; বিশেষতঃ অপরাধের জন্ত একটি ক্ষুদ্র বালককে তাহার দৈনিক পাঠ নকল করিবার জন্ত বাধ্য করাতে নানারূপ অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ বোধ হইতে পারে যে, এইরূপ শাস্তিতে শিক্ষারই সাহায্য হয় এবং পাঠ নকল করাতে তাহা চিরদিন বালকের মনে মুদ্রিত হইয়া থাকে। শিক্ষক কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, প্রত্যাশিত ফল লাভ হয় না। যে সময়টা খাটিয়া পরের দিনের জন্ত পড়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার কিয়দংশ এই লিখন-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায়। যাঁহারা পূর্ণবয়স্কদিগের ন্যায় বালকদিগকেও দৈনিক নয় ঘণ্টা খাটাইতে চাহেন, তাঁহারা বাদে আর সকলেই এ অসুবিধা বুঝিতে পারিবেন। যদি বলেন, খেলার সময় কমাইয়া পড়ার সময় বৃদ্ধি করাই এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, তাহা হইলেই এরূপ ব্যবস্থার অপকারিতা স্বীকার করিতে হইল। শারীরিক ভাবেই হউক, আর মানসিক ভাবেই হউক, খেলার সময়

খাট করিয়া পড়ার সময় বৃদ্ধি করার মত শিক্ষার খারাপ ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। বরং হঠাৎ কোন কারণে পাঠ-ভঙ্গ হইলে মনের স্ফূর্ত্তি বাড়িতে পারে, কিন্তু পাঠের নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপরে আরও কিছু মাত্রা চড়াইয়া দিলে মনের কর্ম্ম-শক্তির ক্ষতি হয়। মনে কর, পাঠের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর আরও কিছুকাল শাস্তি-স্বরূপ পাঠ লিখিতে হইবে; ইহার ফল কি? এই অতিরিক্ত কালের কথা ছাত্রের মনে সর্ব্বদাই জাগিতে থাকে, এবং ইহাতে পাঠাভ্যাসের বিলক্ষণ ক্ষতি করে। পরদিনের জন্য সমস্ত পড়াই যদি ভালরূপে প্রস্তুত না হয়, এই পাঠ লেখাকেই তাহার কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই পাঠ-লেখার শাস্তির জন্য পাঠ অভ্যাস করা ভয়ানক বিরক্তিকর হইয়া উঠে। পরের দিন পর্য্যন্ত এই ভাব থাকিয়া যায়, তাহাতে আরও অনিষ্ট হয়। সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করা অসম্ভব দেখিয়া বালক অসতর্কভাবে তাড়াতাড়ি লিখিয়া শেষ করে; ইহাতে শিক্ষাবিষয়ে যে উপকার হইবার কথা, তাহা ত হইতেই পারে না, কিন্তু অপকার হয়। ছুটির পর সকল বালক চলিয়া গেলে কোন বালককে কয়েদ করিয়া রাখিবার যে প্রথা, তাহারও এইরূপ দোষ। অর্দ্ধ ঘণ্টা নির্জ্জন কারারুদ্ধ না রাখিয়া, গুরুতর অপরাধে অপরাধী বালককে গোপনে ডাকিয়া শিক্ষক যদি পাঁচ মিনিট কাল বুঝান, তাহাতে বালকের পক্ষেও অধিক উপকার, শিক্ষকের পক্ষেও অধিক সুবিধা। লেখক বলেন, কোন কোন সময়ে যখন ছাত্রকে শাসন করা খুব কঠিন বোধ হইয়াছিল, তখনও এই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

কি প্রকার শাস্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এ বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। সময়ে সময়ে শাস্তির প্রয়োজন হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেরূপ ভাবে শাস্তি দেওয়া যায়, তাহার উপরেই ফলাফল নির্ভর করে। যদি অপরাধীর মনে অপরাধের ফল মুদ্রিত করা এবং অপরাপর বালককে হিতকর দৃষ্টান্ত দেখান শাস্তির উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অপরাধ এমন গুরুতর হওয়া চাই যে, শাস্তি না দিয়া উপায়ান্তর নাই। শাস্তিদান শিক্ষকের প্রতি যে কষ্টকর তাহা বেশ বুঝা যাইবে, কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তিনি শাস্তি দিতে বাধ্য হইবেন।

এ সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য এই যে, শাস্তি যেন বিদ্যালয়ের নিত্যানুষ্ঠিত ব্যাপার না হয়। যখন কোন গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তখন আর উপায়ান্তর না থাকিলেই যেন শাস্তি প্রদত্ত হয়। প্রদত্ত শাস্তি ইহাই যেন সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেয় যে, সকলের কল্যাণের জন্য বিদ্যালয়ে যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, মিথ্যা, নির্দ্দয়তা, প্রবঞ্চনা বা অন্য কোনরূপ দুর্নীতি কিছুতেই সেই নিয়মে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, কেমন করিয়া কেবল গুরুতর অপরাধের জন্য শাস্তিকে

সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে? উত্তরচ্ছলে কয়েকটা উপায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সামান্য সামান্য অপরাধ কেবল দেখিলেই হইল, সকলকে জানাইয়া তাহার খবর লইবার কোন প্রয়োজন নাই। যখন কোন বালক ভাল হইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছে বলিয়া বুঝা যায়, তখন শিক্ষক যে তাহার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন, কোন কোন সময়ে সে কথা তাহাকে বুঝিতে না দেওয়াই বিবেচনার কার্য্য। অনেক সময়ে অন্যের অজ্ঞাতসারে কেবল চক্ষের ইসারায় বালককে তাহার দোষ দেখাইয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। অনেক সময়েই এই প্রণালীতে বিশেষ কায পাওয়া যায়। অনেক সময়ে চক্ষের চাহনীতেই যথেষ্ট তিরস্কার হইয়া যায়। অসন্তোষপ্রকাশের এই সহজ অথচ নীরব উপায় অবলম্বন করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে আর শাস্তি দিবার প্রয়োজন হয় না।

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, অনেক সময়েই বালকেরা আগে আত্ম-সংযম এবং বাক্য সংযমের সীমা অতিক্রম করিবার সুযোগ পায়, আবার পরে সেজন্য শাস্তি ভোগ করে। প্রথমতঃ বালকেরা সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রশ্রয় পায়, তাহার পরে শিক্ষক অন্যায় পূর্ব্বক হইলেও বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সীমার ভিতরে যাইতে বাধ্য করেন। বালকদের মনে সদুৎসাহ প্রজ্জ্বলিত কর এবং তাহা স্থির রাখ, তাহা হইলে তাহারা সহজে প্রলোভনে পড়িবে না। শিক্ষকের ভালবাসা পাইবার জন্য বালকদিগের মনে যে প্রকৃতিসিদ্ধ অভিলাষ আছে, সাবধান হইয়া তাহার উচিত ব্যবহার কর। তাহাদের যত্নে যে প্রীতিলাভ করিতেছ, ইহা তাহাদিগকে বুঝিতে দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত কর। ভাল কার্য্যে উৎসাহ-বর্দ্ধন মন্দ কার্য্যের অতি বলবান্ প্রতিষেধক। শিক্ষকের প্রীতিতে যে আনন্দ হয়, তাহা একবার বুঝিতে পারিলে তাহারা ভাল হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে এবং তীব্র নৈরাশ্য অথবা গুরুতর ক্ষতি পরিহার করিবার জন্য তাহারা যেরূপ যত্ন করে, সর্ব্বসমক্ষে ভৎর্সনা পরিহার করিবার জন্যও সেইরূপ যত্ন করিবে।

অতি শৈশবেই যাহাতে বাধ্যতার অভ্যাসশিক্ষা হয়, সে বিষয়ে যত্ন করা অতি প্রয়োজনীয়। যদি শিশুগণ অল্প বয়সেই কোন নির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিতানুসারে এক-যোগে চলিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের শাসন কার্য্য অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া আইসে। যুগপৎ অঙ্গ চালন—যথা উত্থান, উপবেশন, এবং সমান্তর পাদবিক্ষেপ—শাসনের পক্ষে যেমন অনুকূল, বালকদিগের পক্ষেও সেইরূপ আমোদজনক। আমেরিকার কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময়ে সমান্তর-চলনের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। লণ্ডনের বিদ্যালয়-সমূহে যে ডুমুড়ান ডেস্ক প্রচলিত হইয়াছে, আমেরিকার বিদ্যালয়ে অঙ্গ-চালন-শিক্ষায় তাহাও কাযে লাগিয়াছে। প্রত্যেক ডেস্কে দুই জনের স্থান আছে। ডেস্কগুলি সারি সারি করিয়া সাজান হয়, এবং তাহার দুই প্রান্ত দিয়া চলিবার রাস্তা থাকে। লিখিবার সময়ে

ডেস্কের উপরে যে স্থানে হাত থাকে, উঠিয়া যাইবার সুবিধার জন্ত তাহা দুমুড়ান যায়। এক ডেস্কের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে যে বালক উঠিয়া যায়, অপর ডেস্কের বাম পার্শ্বের বালক আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হয়। ইহাতে গোলমাল হইতে পারে, এজন্য নিয়ম আছে, ডাইনদিক্ হইতে যে আইসে, সে আগে যায়, আর বামদিক্ হইতে যে আইসে সে পাছে থাকে। এক, দুই, এবং তিন সংখ্যা দ্বারা অঙ্গ-চালনের সঙ্কেত করা হয়। শিক্ষক যখন বলেন, "এক" তখন বুঝিতে হইবে "ডেস্ক দুমুড়াও"; "দুই" অর্থাৎ "উঠিয়া দাঁড়াও"; "তিন" অর্থাৎ "অবকাশ পথে চল।" সংখ্যাগুলির উল্লেখ মাত্রই তথানুষ্ঠিত হয়। এইরূপ কোন প্রকার কাওয়াজী ধরনের শিক্ষা শাসন কার্য্যের সহায়তা করে, কারণ ইহাতে বালকদিগকে আজ্ঞামাত্রই তাহা পালন করিবার শিক্ষা দেয়। এইরূপ অঙ্গ-চালনা শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিতে বালকেরা আমোদ পায়। সমান্তর চলনের সময়ে কোন বাদ্যযন্ত্র তালে তালে বাজাইতে পারিলে সে আনন্দের আরও বৃদ্ধি হয়। শ্রেণী পরিবর্ত্তন অথবা কার্য্যারম্ভের সময়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশকরণ, কিম্বা ছুটি হইলে বহির্গমনের সময়ে কিছু কিছু সময় এই সমান্তর চলনে ব্যয় করিলে তাহা অপব্যয় হয় না। জর্ম্মনি এবং আমেরিকায় এই সমান্তর চলনের প্রথা খুব অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, এবং তাহাতে শাসন-কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইতেছে।

নিউইয়র্ক নগরে কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ-সময়ে নিম্নশ্রেণীর বালকদিগের যে সমান্তর পাদ বিক্ষেপ গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর। নয়টা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের তেতলায় হলের মধ্যে প্রধান শিক্ষক একাকী বসিয়া আছেন, গ্রন্থকারও তাঁহার সঙ্গে বসিলেন। ঠিক নয়টা বাজিবামাত্র একটি বালক গৃহে প্রবেশ করিল, এবং প্লাট্‌ফর্ম্ অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থানের পশ্চাৎদিকে দেওয়ালের সঙ্গে সাজান কতকগুলি ঘণ্টাটানা তার স্পর্শ করিল। তৎপরে প্লাট্‌ফর্মের সম্মুখে যে একটা পিয়ানো নামক বাদ্যযন্ত্র স্থাপিত ছিল, একজন শিক্ষক আসিয়া তাহার নিকটে বসিলেন এবং সমান্তর পাদ-বিক্ষেপের একটি তাল বাজাইতে লাগিলেন। বালক-দিগের প্রবেশের পাঁচটি দ্বার আছে। দেখিতে দেখিতে সেই পাঁচটি দ্বার দিয়া পাঁচসারি বালক গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল; বালকগুলি এত ঘনভাবে দাঁড়া-ইয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় তাহারা যেন পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছে। ঠিক সৈন্যদিগের ন্যায় সুশিক্ষিতভাবে বামপদে বিশেষ দৃঢ়ভাবে বিক্ষেপের শব্দ করিতে করিতে সারিগুলি আসিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিতে লাগিল, এবং অগ্রে যাহারা ছিল, তাহারা সারি ছাড়িয়া সম্মুখের কাষ্ঠাসন গুলিতে উপবেশন করিল। কিঞ্চিদধিক চারি মিনিট সময়ের মধ্যে সহস্র বালক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া আপন আপন আসন গ্রহণ করিল, গৃহটি পূর্ণ হইল। প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে গ্রন্থকার একটুকু বাইবেল পড়িলেন; তাহার পরে বালকেরা একটি স্তোত্র পাঠ করিল; সর্ব্বশেষে একটি রচনা পাঠ এবং একটি মুখস্থ কবিতার আবৃত্তি হইল। আবার প্রতিগমন আরম্ভ হইল, প্রতিগমনের স্বতন্ত্র তাল বাজিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বিস্তীর্ণ গৃহ প্রায় পরিষ্কার হইল, কেবল তাহার তিনকোণে তিনটি ক্ষুদ্র শ্রেণী রহিয়া গেল।

অধিক বৈচিত্র্যময়, সুতরাং অধিক কল্যপ্রদ এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রন্থকার মার্কিনের কোন বিদ্যালয়গৃহে দর্শন করিয়াছিলেন। একটিমাত্র শ্রেণীর চলন-ক্রিয়া এক সময়ে হইতেছিল; ইহাতে ধীর পাদ-বিক্ষেপ হইতে আরম্ভ করিয়া দৌড় পর্য্যন্ত ছিল। প্রথমতঃ বালকেরা ধীরে ধীরে চলিয়া নানা রকমে ঘুরা ফিরা করিল; তাহার পরে ক্রমে দ্রুত চলিতে লাগিল; ক্রমে এই গতি প্রথমের দ্বিগুণে পরিণত হইল, এবং বালকের সারি সরল রেখায় না চলিয়া সুন্দর বক্রভাবে ঢেউ-খেলার মত চলিতে লাগিল। যখন বালকেরা রীতিমত দৌড়িতেছে, এমন সময়ে বাদ্যের তাল হঠাৎ অর্দ্ধমাত্রায় কিংবা চতুর্থাংশ মাত্রায় পরিবর্ত্তিত হইল, এবং সমস্ত বালক তাহা শুনিবামাত্র তৎ-ক্ষণাৎ একযোগে ঠিক সেই মাত্রায় চলিতে লাগিল। তাহাদের গতির দিক্ এবং মাত্রা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ইহাতে তাহাদের মনঃসংযোগ এবং শরীর-সঞ্চালন ক্রিয়া যুগপৎ পরিচালিত হইতে লাগিল। গ্রন্থকার যে শ্রেণীতে এইরূপ চলন-ক্রিয়া দেখিয়াছিলেন, সে শ্রেণীটি বালিকাদিগের। বালিকারা ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাতে যে কেবল প্রকৃতিগত অঙ্গচালন-স্পৃহা চরিতার্থ হইয়াছিল তাহা নহে; ইহাতে বিশ্রাম-ভোগ এবং শিক্ষালাভ এই দুই উদ্দেশ্যই যুগপৎ সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ অঙ্গচালনা বালকের বশ্যতাকে অভ্যস্ত এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

শিক্ষক সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, নীরবতার সঙ্গে শাসন-নৈপুণ্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। খুব চীৎকার-স্বরে কর্তৃত্ব-বিজ্ঞাপক আদেশ প্রচার করিলে বালকেরা বাধ্য থাকে, অনেকে এরূপ মনে করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। স্থির গম্ভীরভাবে আদেশ প্রচার করিলে তাহাতে বালক-দিগের মধ্যেও স্থির, গম্ভীরভাব জন্মায়। ইহাতে দ্বিবিধ ভাব বালকের মনে উৎ-পাদিত করে;—১ম, আজ্ঞামাত্রই বালক বশ্যতা প্রদর্শন করিবে, শিক্ষক এমন প্রত্যাশা করেন; ২য়, একান্তই বশ্যতা প্রদর্শন না করিলে বল দ্বারা যে তিনি বাধ্য করিতে পারেন, সে শক্তিও তাঁহার হাতে আছে। প্রথমে ডেস্কের উপরে বেত্রাঘাত করিয়া, তাহার পরে যথাশক্তি চীৎকার-স্বরে নীরব হইবার জন্য আদেশ করা শোভা পায় না। হঠাৎ দমকা-বাতাসে ক্ষণকাল স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরের জলধারা আবার যেমন ঝরিতে থাকে, সেইরূপ ভীষণ চীৎকারে ক্ষণমাত্র নিস্তব্ধ হইয়া আবার বালকেরা গোলমাল করিতে থাকে। যে শক্তি থাকিলে শিক্ষক নিজে তাহা উপলব্ধি করেন, আর ছাত্রেরাও বুঝিতে পারে, শাসনে শান্তভাবই তাহার প্রকৃত লক্ষণ। যে কোন বিভাগে অভিজ্ঞতা থাকিলেই এ কথা বুঝা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সহস্র যাত্রীবাহী একখানি অর্ণবপোতের কথা স্মরণ কর। জাহাজের কাপ্তেন সাধারণ আলাপের স্বরে সন্নিহিত অধীন কর্ম্মচারীকে একটী কথা বলেন, আর এই কর্ম্মচারীর নিকট হইতে পরম্পরা-

ভাবে সকলের নিকটই সেই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। জাহাজের অধিনায়ক পরিচালক হইতে অনেক দূরে; অধিনায়ক তাঁহার সন্নিহিত গতি দর্শন যন্ত্রে অঙ্গুলিটী স্পর্শ করিলেন,অমনি পরিচালকের সন্নিহিত গতি-দর্শন-যন্ত্রের কাঁটা ঘুরিল; জাহাজের কেহই কিছু জানিল না, অথচ আদেশ প্রতিপালিত হইয়া গেল। কেবল কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে কোন আদেশ প্রচারিত হইলে তাহাই মাত্র অরোহিগণ শুনিতে পায়। ইহাই প্রকৃত শাসন বা পরিচালনের আদর্শ দৃষ্টান্ত। বিদ্যালয়ে শক্তির এই নীরব ক্রিয়া অতি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কথা না কহিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার সঙ্কেত অবলম্বন করিলে শিক্ষকেরা বুঝিবেন, ইহাতে অনেক সুবিধা।

তৃতীয় অধ্যায়।

জ্ঞানোপধান।

বিবিধ পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে উপকারিতা কাহার কত, গ্রন্থকার সে প্রশ্ন স্পর্শও করিলেন না। এ বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছে, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। যে কোন বিষয়ে হউক, জ্ঞানোপধান অর্থাৎ শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী কি, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। শিক্ষাদানে কৃতকার্য্যতার অত্যাবশ্যক উপকরণ কি কি; তাহা অবধারণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ছাত্রদিগের শিক্ষা এবং বয়স যতদূর থাকুক, তাহাদের মনোযোগ উত্তেজিত করা এবং তাহা অক্ষুণ্ণ রাখাই শিক্ষাদানে প্রথম প্রয়োজনীয়। সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে হইলে অধ্যাপনকে এমন করিতে হইবে, যাহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। শিক্ষার প্রথমাবস্থায় একমাত্র মনোযোগাকর্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কায। যে সকল অস্থির-প্রকৃতি অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে বিদ্যালয়ের নিয়মাদি নিতান্ত বিরক্তিকর, যে রূপেই হউক তাহাদিগেরও মনোযোগ উৎপাদন করিতে হইবে। কোন নূতন বিষয়ে বালকের চিত্তাকর্ষক কিছু থাকিলে যতক্ষণ তাহার নূতনত্ব ততক্ষণই বালকের মনোযোগ; শিশু আপন মনে এক বিষয় ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে মন দিতেছে, কোন বাধা পাইতেছে না; কিন্তু এখন তাহাদের মানসিক গতিতে বাধা দানে তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এখন তাহাদিগকে অন্যের ইচ্ছামত পরিচালিত হওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। এরূপ করিবার প্রয়োজন যখন স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, তখন বালকের ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, ইহা তাহাকে করিতেই হইবে, এমন কথা বলিতে আমাদিগের সহসা প্রবৃত্তি হয়। অনেক গুলি সুচিন্তনীয় বিষয়কে এইরূপ চিন্তাহীন অগভীর প্রচলিত কথা দিয়া আমরা ঢাকিয়া রাখি। কেবল প্রভুত্বের পরিচালনায় মনোযোগ জন্মে না। বিদ্যালয়ের অনেক কার্য্যেই প্রভুত্বের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু "মনোযোগ দেও"

বলিয়া হুকুম করিলেই তাহা পাওয়া যায় না। শিক্ষক যদি বালকের মনোযোগের জন্ত প্রভুত্বের উপরে নির্ভর করেন, তবে গোড়াতেই একটা বিষম ভ্রম হইয়া গেল। অশিক্ষিত মনের অভাব কি,তাহা অবধারণ করিয়া শিক্ষককে তদনুসারে চলিতে হইবে। যাহা শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক হয়, তাহাতেই তাহারা মনোযোগ দেয়। ইহাতেই বুঝা যাইবে, শিশুদিগের মনোযোগ-চালনে শিক্ষকের কিরূপ সাহায্যের প্রয়োজন। তাহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করা যে শিক্ষকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। শিক্ষণীয় বিষয়ে যাহাতে শিশুর অভিরুচি জাগ্রত হয়, শিক্ষককে তাহা সেই ভাবে উপস্থিত করিতে হইবে। বাস্তবিক যে কেহ অন্তকে উপদেশ দিবার ভার গ্রহণ করে, তাহার স্কন্ধেই এই কর্ত্তব্যটি ন্যস্ত হয়। যেরূপ মানসিক নিয়মে মনশ্চক্ষুর পুরোগত বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, কি লেখক, কি উকীল, কি উপদেষ্টা, কি বক্তা, সকলকেই তাহা বিশেষ চিন্তার সহিত অবধারণ করিতে হয়। অন্যকে শিক্ষা দেওয়া যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগের সকলের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরও এ বিষয়ে সমতা রহিয়াছে। কাহার শক্তি কত, কে কিরূপ আসন পাইবার যোগ্য, ইহাতেই তাহা প্রকাশ পায়। যখন মনে হয় যে, শিক্ষক ভবিষ্যতের সকল প্রকার উন্নত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন তাঁহার এতদ্বিষয়ক কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়াই বোধ হয়। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে শিক্ষা চলিতে থাকে, শিক্ষক শিশুকে প্রথম তাহাতে প্রবর্ত্তিত করেন। বাল্য-শিক্ষক বালকের মনে বৎসর বৎসর কেবল কতকগুলি জ্ঞান উপহিত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না; ভবিষ্যতে জাতীয় মানসিক কার্য্য ক্ষেত্রে যাহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন হইবে, মনের সেই গ্রহণ-শক্তি এবং ধারণ শক্তিকে তিনি বিশেষরূপে স্ফুরিত করেন। ভবিষ্যতে যাহারা অন্তের শিক্ষক হইবে, এবং যাহারা তত্ত্বানুসন্ধানে লিপ্ত থাকিবে, বাল্য শিক্ষক তাহাদিগেরই বুদ্ধি-বৃত্তিকে মার্জ্জিত করেন।

বালকের কৌতূহল-বৃত্তি শিক্ষককে মনোযোগ-রক্ষণে সাহায্য করে, কিন্তু আবার ইহাও সত্য যে, তাহাদের স্বাভাবিক অস্থিরতা এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয়। কৌতূহল দ্বারা অস্থিরতাকে প্রশমিত করিতে হইবে। কৌতূহলকে জাগ্রত করা ও স্থিরতর রাখা, এবং যাহাতে কৌতূহল পরিতৃপ্ত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা যোগাইয়া কৌতূহলের বল বৃদ্ধি করাই অধ্যাপকের কৃতকার্য্যতা। এ স্থলে শিক্ষকের অনেক ভাবিবার কথা আছে। ইন্দ্রিয় পথে যাহা আইসে, বালকেরা তাহা অতি সহজে গ্রহণ করে। সুতরাং অধ্যাপনের সময়ে বালকের চক্ষুঃ এবং কর্ণকে সজাগ রাখিতে পারিলেই অনেক কায হইল মনে করিতে হইবে। উভয় পথ দ্বারা মনে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে অধিক ফল-লাভ হয়। শিক্ষাতে চক্ষুঃ যে খুব বেশী সাহায্য করে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কোন কোন স্থলে

শ্রবণেন্দ্রিয়ের, সাহায্যেই সুন্দররূপে সত্য লাভ করা যায়, এ কথা সত্য হইলেও, চক্ষু দ্বারা কর্ণকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা যে সকলেরই হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বক্তার কথা শুনিবার সময়ে সকলেই বক্তাকে দেখিতে চায়। সকল অভিজ্ঞ বক্তাই জানেন, চক্ষের দিকে না চাহিয়া কেবল কর্ণকুহরে বাক্য-রাশি ঢালিলে তাঁহাদের অনেক শক্তি বৃথা ব্যয় হয়। যখন ঐকতান বাদ্য শ্রবণ করি, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেকটি যন্ত্র কেমন করিয়া বাজায়, তাহা দেখিবার জন্য আমাদের প্রবল ইচ্ছা হয়। চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া শুনিলে খুব সম্ভবতঃ বাদ্য-কৌশল অধিক স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, কিন্তু স্বরের মাধুর্য্য অপেক্ষা দৃষ্টির মোহ অনেকের অধিকতর প্রবল। দর্শনের মোহকারিতা বোধ হয় বয়স্কদিগের অপেক্ষা বালক ও বালিকাদিগের অধিকতর গাঢ়। এই জন্যই শিক্ষার সর্ব্বাবস্থায় কাষ্ঠ ফলকের এত প্রয়োজন; এই জন্যই শিশুদিগের বস্তু শিক্ষায় এত উপকার; এই জন্যই বস্তু-নিরপেক্ষ চিন্তা অপেক্ষা যে সকল বিজ্ঞানে পর্য্যবেক্ষা এবং পরীক্ষার প্রয়োজন, তাহাতে এত অধিক আনন্দ। প্রত্যেক শিক্ষকেরই এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত। শিক্ষক যখন কোন শ্রেণীতে শিক্ষা দানে ব্যাপৃত থাকেন, তখন সকল বালকই তাঁহাকে দেখিতে চায়। যতক্ষণ শিক্ষক বাক্য দ্বারা তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন, ততক্ষণ তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহাদের প্রবল থাকে। যতক্ষণ তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন, ততক্ষণ তাহাদের সকলের চক্ষুঃ তাঁহার উপর স্থির হইয়া থাকে। যেমন শিক্ষকের অধ্যাপন-কার্য্য ঢিমা, একসুরা এবং মানসিক যত্নবর্জ্জিত হইয়া উঠে, অমনি বালকদিগের চক্ষুঃ জ্যোতিহীন হইয়া লক্ষ্য স্থান হইতে ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ছাত্রকে নিবিষ্ট করিতে হইলে শিক্ষককেও নিবিষ্ট হইতে হইবে। শিক্ষকের নিকট যদি শিক্ষা-কার্য্য একসুরা নিত্যকর্ম্ম মাত্র বলিয়া বোধ হয়, ছাত্রের নিকট তাহা এতদপেক্ষা ভাল হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে মানসিক সতেজতার জন্য বালকদিগকে দায়ী করিতে গেলে নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, সুতরাং তাহা করা যাইতে পারে না। অবশ্য বালকেরাও সময়ে সময়ে মনোনিবেশের বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার সঙ্গে শিক্ষার সংস্রব থাকার সম্ভাবনা যত, না থাকার সম্ভাবনাও তত। সময়ে সময়ে পাঠ্য বিষয়ই এমন থাকে যে, তাহাতেই বিলক্ষণ-রূপে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহার বিপরীত ঘটে; তখন শিক্ষক যদি পাঠ্য বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করিতে পারেন, তাহা হইলেই ছাত্রের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

একটা বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। যে কোন বিষয়ে হউক, এক বিষয়ে মনোযোগ বরাবর স্থির থাকিতে পারে না। যদি ক্রমশঃ মনোযোগ শিথিল

হইতে থাকে, তাহাতে শিক্ষক বা বালক কাহাকেও দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ছাত্রদিগের প্রয়োজন বুঝিয়া সময়ে সময়ে পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা শিক্ষায় কৃতকার্য্যতার পক্ষে একটি প্রধান উপায়। সময়ে সময়ে পাঠের পর্য্যায়-ভঙ্গ দ্বারা দীর্ঘকাল মনোযোগ রক্ষার সাহায্য হইতে পারে। নিয়মিত সময় বিভাগে উপকার আছে বটে, কিন্তু তাহাতে এত বাধাবাঁধি থাকা উচিত নয় যে, প্রয়োজনানুসারে বৈচিত্র বা পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইতে না পারে। পাঠ্যের জন্য বিভক্ত সময়ে নিরর্থক পরিবর্ত্তন করিলে অবশ্য অনেক অসুবিধা হয়। কিন্তু পাঠের কোন কোন অংশ খুব কঠিন থাকে, সুতরাং তাহাতে শিক্ষার্থীর ক্লান্তি জন্মে। সহজ বিষয়ের ন্যায় কঠিন বিষয়েও সমানভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বালকের মনোবৃত্তিকে ব্যাপৃত রাখা বিষম ভুল। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সময় বিভাগের বিশেষ আদর করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৎসরের সকল দিনে বিদ্যালয়ের কার্য্য কেবল ঘড়ি দ্বারা পরিমাণ করিতে হইলে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় বুদ্ধি বৃত্তি-পরিচালনের আর স্থান থাকে না। পরিমাণ ভাবিয়া বিচার করিতে গেলে বুঝা যাইবে, দিবসের কত সময় কোন্ বিষয়ে দেওয়া উচিত, শিক্ষক স্বাধীনভাবে তাহা অবধারণ করিলে যতটা উপকারের সম্ভাবনা, নিয়মিত সময়-বিভাগের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলেই গুরুতর অপরাধ হইল মনে করিলে সেরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যেরূপেই হউক, অন্ধ নিয়মের হাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষক শিক্ষা সৌকর্য্যের অনুরোধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও আপন স্বাধীনতার পরিচালন করিতে পারিবেন না, জাতীয় শিক্ষার নিয়মাবলীতে এতটা বাঁধা-বাঁধি থাকা উচিত নহে।

বালকের বয়স এবং শিক্ষার পরিমাণানুসারে তাহাদের পাঠ্য-নির্দ্ধারণে বৈচিত্র রক্ষা করিতে হইবে। প্রথমেই পর্য্যবেক্ষা-শক্তির কার্য্য প্রকাশ পায়, সুতরাং শিশু-দিগের এই শক্তি যাহাতে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার চেষ্টাই প্রথমে করিতে হইবে। যাঁহারা শিশুদিগের শিক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের সমধিক পরিমাণ শিক্ষা-শক্তি থাকার প্রয়োজন। ব্যবহারে প্রসন্নতা, যথোচিতরূপে বর্ণনা করিবার শক্তি, কল্পনার প্রসার, এক বিষয় হইতে অনুরূপ বিষয়ান্তরে অক্লেশে অথচ শীঘ্র চলিয়া যাইবার দক্ষতা, এবং শিশুদিগের সরল ও স্বাধীন ব্যবহারে আনন্দ, এই সকল গুণ যাঁহার আছে, তিনিই প্রথম-শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষা দানের উপযুক্ত শিক্ষক। ছবি-প্রদর্শন এবং পদার্থ-পরিচয়ে শিশুদিগের কৌতূহলোদ্দীপনে সাহায্য হয়। শিশুগণ আপনা হইতে যাহা স্মরণ করে, প্রথমা-বস্থায় তাহাতেই তাহাদের স্মৃতি-শক্তির পরিচালনকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। ছবি সুন্দর বলিয়া, গল্প মনোহর বলিয়া, অথবা সঙ্গীত বা কবিতার সুর চিত্তাকর্ষক, বলিয়া যদি ঐ সকল তাহারা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

পাঠ এইরূপে সহজ করাতে অনেকে আপত্তি করেন। পাঠ-বহির্ভূত বিষয় দিয়া চিত্ত আকর্ষণ করা তাঁহারা ভাল বাসেন না। তাঁহাদের বিবেচনায়, প্রথম-শিক্ষার্থীর জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক উদ্ভাবিত এই সহজ এবং মনোজ্ঞ প্রথার মধ্যে প্রাচীন প্রথার গাম্ভীর্য্য নাই। শিশুদিগকে যেন কোন প্রকার কাঠিন্য এবং কঠোরতা সহিতে হইবে না, এই মনে করিয়া সকল বিষয়ই সহজ এবং মনোজ্ঞ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; এবং এই প্রথায় যাঁহারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, গ্রন্থকার তাঁহাদিগের প্রতিও সহানুভূতি রাখেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে শিশুকে যতটা খাটিতে হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, শিশু পরীক্ষা এবং পরিশ্রমে অনভ্যস্ত হইয়া উঠিবে বলিয়া ভয় করিবার কোন কারণ থাকে না। কঠিনতা কমাইয়া উন্নতির পথ সুগম করিবার যে যত্ন, তাহার অনুকূলে যথেষ্ট কারণ আছে। এ বিষয়ে ডাক্তার কার্পেণ্টার যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্যই মনোযোগের সহিত শুনিবার কথা। তিনি বলেন;—"যে সকল দৃঢ়মনস্ক শিক্ষক শিশু-শিক্ষা আমোদজনক করিবার প্রথাকে অনুচিত এবং অস্পৃহনীয় দুর্ব্বলতার চিহ্ন মনে করেন, তাঁহারা জানেন না যে, শিশু-জীবনের এই অবস্থায় ইচ্ছা শক্তি, অর্থাৎ আত্ম-শাসন-শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে; শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্যই এই শক্তিকে উৎসাহ দ্বারা দৃঢ় করা, তাহা চাপাইয়া নিস্তেজ করা নহে। এই মূল নিয়মটি অবগত না থাকায় অনেক সময়ে শিক্ষক এবং অভিভাবকেরা ভয়ানক ভ্রমে পতিত হন; যাহা শিশুর ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাকেই তাঁহারা তাহার ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বাস্তবিক যন্ত্রবৎ পরিচালিত শিশু-মস্তিষ্কের উপরে তাহার ইচ্ছা-শক্তির কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই বলিয়াই ঐরূপ অপরাধ ঘটে। যে বাধ্যতা শিশু-শক্তির অতীত, সেই বাধ্যতা প্রদর্শন করিতে পারে না বলিয়া শিশুকে শাস্তি দেওয়াতে যে অনিষ্ট হয়, তাহার প্রতিকার একরূপ অসম্ভব।"

স্বতঃসম্পাদিত পর্য্যবেক্ষা এবং স্মরণ-ক্রিয়া হইতে শিশুকে ক্রমে ক্রমে ইচ্ছাকৃত একাগ্র অভিনিবেশে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এই হইতেই নিয়মিত পাঠ আরম্ভ হয়। যে বিষয়ে প্রস্তুত হইতে যত্ন লাগে, তাহা কঠোর কর্ত্তব্য; এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রথমাবস্থায় তাহা বিশেষ ক্লান্তি-কর। ছাত্রদিগকে বাল্যকালেই ইচ্ছাকৃত যত্নের অভ্যাস আরম্ভ করিতে হইবে, কারণ ইহার উপরেই তাহাদের উন্নতি এবং ভবিষ্যৎকালের প্রভাব নির্ভর করে। বালককে উপযুক্ত যত্ন শিক্ষা দিবার উপায়-নির্দ্ধারণে শিক্ষকের যে বিবেচনাশক্তির প্রয়োজন, তাহা অতি গুরুতর বিষয়। শিক্ষক শিক্ষা কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার পরিচয় এইস্থলেই আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে ছাত্রকে সাহায্য করা যে শিক্ষকের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সাহায্য ফলোপ-ধায়ক করিতে হইলে, ছাত্র যাহাতে নিজের কার নিজে করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহা-

দিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। শিক্ষক ছাত্রের হৃদয়ে জ্ঞান-লাভের যত আগ্রহ জন্মাইতে পারেন, এবং যে পরিমাণে তাহা পরিচালিত ও পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, সেই পরিমাণে এই সাহায্য দানে কৃতকার্য্য হন। শিক্ষক ছাত্রের হৃদয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া দিবেন, এবং তাহাকে এমনভাবে সাহায্য করিবেন, যেন সে উৎসাহ পায়, কিন্তু আপনার যত্নে কোন বিষয় জানিতে পারিলে যে আনন্দ জন্মে, তাহা হইতে যেন সে বঞ্চিত না হয়। বালকদের হৃদয়ে কেবল জ্ঞান-পিপাসা থাকিলেই হইল না, কিন্তু আপন আপন বৃত্তির পরিচালনে যে শক্তি আছে, সে বোধও তাহাদের থাকা চাই। ইহা কেবল স্মরণ শক্তির পরিচালনে সম্ভবে না, ইহাতে ইচ্ছাকৃত পর্য্যবেক্ষা এবং বিচার-শক্তির প্রয়োজন। অবশ্য বালকেরা যাহা ভালরূপ বুঝে না, এমন অনেক কথা তাহাদিগের মুখস্থ না করিলে চলে না। এইরূপে স্মৃতি ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন অল্প বিস্তর সকল প্রকার শিক্ষাতেই আছে। এ বিষয়ে থ্রিং সাহেবের কথাগুলি বড় মূল্যবান্। তিনি বলেন, "বালকদিগের স্মরণ-শক্তি প্রবল এবং যুক্তি বোধ দুর্ব্বল। সকল প্রকার শিক্ষাই এই ধ্রুব সত্যটি স্মরণ রাখিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিষয় বুঝা, সকল বিষয় ভালরূপে শিক্ষা করা, ইত্যাদি বড় বড় কথা শুনিতে ভাল, কিন্তু ইহাতে বিষয়ের গুরুত্ব ঢাকিয়া রাখে। এ সকল কথার মত কার্য্য করিতে গেলে বালককে বলিতে হয়, সাঁতার শিখ, কিন্তু জলে নামিও না।" সকল কথাই বুঝাইয়া দিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে শিক্ষকের কঠিন কার্য্য আরও কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা হইলেও, আমেরিকার নিউজার্সীর অন্তর্গত প্রিন্স্‌টাউন নগরের অধ্যাপক হার্ট এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অতি সত্য। তিনি বলেন, "প্রথমে জ্ঞান, তাহার পরে স্মরণ-শক্তি, ইহাই যথার্থ মানসিক পর্য্যায়। আগে জ্ঞান সংগ্রহ কর, তাহার পরে তাহা স্মরণ রাখ।" বুঝাইবার প্রথা শিক্ষককে প্রথম হইতেই অবলম্বন করিতে হইবে। এই কার্য্যের উপর শিক্ষকের কৃতকার্য্যতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ধরাবাঁধা ব্যাখ্যা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করাই যথেষ্ঠ নহে। হৃদয়ে চিন্তার উদ্রেক করিয়া দেওয়া, বুদ্ধি-বৃত্তি খেলিতে পারে, এমন ভাবে প্রশ্ন করা, এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মনে কৌতূহলের সঞ্চার করিতে পারে, এমনভাবে পাঠ্য বিষয়কে বিবিধ প্রকারে এবং বিবিধ সম্বন্ধে উপস্থিত করা, এই সকল বিষয়ে নিপুণতা থাকার নিতান্ত প্রয়োজন। যে সকল উপাদান বা ক্ষুদ্র অংশে পাঠ্য বিষয়টি গঠিত হইয়াছে, প্রথমতঃ সেই সকল অংশ পৃথক করিয়া দেখাও, তাহার পরে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাও, সর্ব্বশেষে তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য প্রদর্শন কর, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে,—ইহাতে যুগপৎ বালকের স্মরণ-শক্তি পরিচালিত এবং বুদ্ধি-বৃত্তি উদ্দীপিত হইবে।

উদ্দেশ্য বিষয়ে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে শিক্ষকের প্রকৃতকার্য্য কি। কেবল পড়া শুনিয়া ভাল মন্দ বিচার করা, আর প্রশ্নের উত্তর অনুসারে সংখ্যা দেওয়াই শিক্ষকের কার্য্য নহে, শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার কার্য্য। তাঁহার সকল কার্য্যে প্রধান কার্য্য শিক্ষা দান। শিক্ষক আর যাহাই করুন, তাহা অধ্যাপনের নিম্নে থাকিবে, এবং অধ্যাপনের সহায়তা করিবে। পড়া শুনিয়া ভাল-মন্দ বিচার করা, অথবা প্রশ্নের উত্তর অনুসারে সংখ্যা দিবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে; কিন্তু যে শিক্ষক কেবল এই সকল লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি আপনাকে এবং আপনার ব্যবসায়কে উচ্চ আদর্শ হইতে অধঃপাতিত করেন। এরূপ শিক্ষক সামান্য মজুর মাত্র, আর এরূপ বিদ্যালয়ের ছাত্রও শিক্ষা-কার্য্যকে মজুরি বলিয়াই মনে করে। তিনি শীঘ্রই মজুরের সরদার হইয়া পড়েন, ছাত্রেরাও তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখে। কিন্তু যিনি কেবল মুখস্থ পড়া না শুনিয়া প্রকৃত অধ্যাপক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বালকদিগের সঙ্গে তীব্র সহানুভূতি স্থাপন করিতে হইবে, বালকদিগের যাহা কঠিন বোধ হয় তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, এবং নিজের উন্নত বিদ্যা দ্বারা এমনভাবে তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে, যেন তাহাদের কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং ক্রিয়া শক্তি প্রসর পায়। প্রকৃত শিক্ষক যিনি, তিনি কেবল মজুরের সরদার হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন, তিনি পরীক্ষক হইতেও অনেক উচ্চ। যিনি প্রকৃত শিক্ষক, পরীক্ষকের কার্য্য তাঁহার নিকট বিরক্তি-কর বোধ হইবে। তিনি অধ্যাপনরূপ সুখের কার্য্য পাইলে পরীক্ষা এবং পরি-দর্শন-কার্য্য সাহ্লাদে অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইবেন। এরূপ শিক্ষক ছাত্রের পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার বিচারে সম্মত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি এই ভাবিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন যে, তাঁহার অধ্যাপনে যে ফল জন্মিয়াছে, পরীক্ষারূপ যন্ত্রদ্বারা তাহার পরিমাণ হইতে পারে না। অধ্যা-পনের কৃতকার্য্যতায় যাহা কিছুর প্রয়োজন, তাহাতেই শিক্ষা এবং পরীক্ষার মৌলিক প্রভেদ স্মরণ রাখিতে হইবে। পূর্ব্ব দিবসের বৈকালে বালক কতটা পড়া প্রস্তুত করিয়াছে, যে শিক্ষক কেবল তাহাই দেখেন, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক শিক্ষক-জীবনের মহত্ত্ব খর্ব্ব করেন।

শিক্ষক তবে কেবল পড়া না শুনিয়া আর কি করিবেন? তিনি বালকদিগের অধ্যয়নে কিরূপে সাহায্য করিবেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তরদিবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে।

বালকদিগকে দিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইতে হইবে না। পাঠের পরিমাণ কৃতকার্য্যতার পরিচায়ক নহে। পাঠের পরিমাণ অত্যধিক হইলে ফল শোচনীয় হইতে পারে। পাঠের পরিমাণ বরং নিতান্ত কম হওয়া ভাল, তথাপি নিতান্ত বেশী হওয়া ভাল নহে। বর্ত্তমান সময়ে পরিমাণের দিকে অধিক লক্ষ্য থাকাতে ফল বড় শোচনীয় হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ যদি এত দীর্ঘ হয় যে তাহার জন্য সমস্ত দিন রাত্রি না খাটিলে চলে না, তাহা হইলে বালক তাহা দেখিয়াই ভয় পায় এবং ইহাতে উন্নতির ব্যাঘাত হয়। কোন কোন বালকের পাঠ পিপাসা এত প্রবল যে, তাহারা দীর্ঘ পাঠে ক্লান্ত হয় না; কিন্তু এই সকল বালকের মনে খেলার ইচ্ছা উদ্দীপিত করিয়া যদি তাহার পরিতৃপ্তির উপায় অবলম্বিত হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের নিজের, তাহাদের পিতামাতার, এবং সমগ্র জাতির মঙ্গল হইত। ইহা একরূপ অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শিক্ষার শুভ ফল পাইতে হইলে সমস্ত অপরাহ্নটা পাঠাভ্যাসে নিয়োজিত করা উচিত নহে। বাড়ীতে পড়া শুনার সময়-নির্দ্দেশ প্রভৃতি বন্দোবস্তের জন্য পিতামাতা বা অভিভাবক দায়ী; কিন্তু বালকের শক্তি এবং শিক্ষার পরিমাণ অনুসারে পাঠ্য পরিমাণ অবধারণ করিয়া দিবার দায়িত্ব তাহার শিক্ষকের। শিক্ষক এবং ছাত্রকে অনেক সময়ে যে গোলযোগ এবং পরীক্ষায় পতিত হইতে হয়, তাহার অধিকাংশই পাঠ্য-পরিমাণ অবধারণ করিবার দোষে ঘটে। বিদ্যালয়ের ছুটির তাড়াতাড়ির মধ্যে, শিক্ষক যদি নিজের বিবেচনা না করিয়া ঐরূপ বিষয়ের জন্য অনেকটা পড়া স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রিটা ছাত্রের নিদ্রালয়ে কাটিবে, আর পরদিন শিক্ষককেও সেরূপ ভুগিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় শিক্ষককে যে বিরক্তি ভোগ করিতে হয়, তাহা তাঁহার স্বকৃত।

এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বালকেরা যদি আংশিকভাবে পড়া প্রস্তুত করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইবার অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহাদের অবনতি হইতে থাকে। বিদ্যালয় তাহাদের নিকট যাহা চায়, তাহা আর পায় না। পড়া প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদের যতটা ভাবা উচিত, তাহারা ততটা আর ভাবে না। ইহা বিদ্যালয় পরিচালনের ঘোরতর ব্যাঘাত মনে করিয়া সাবধান হইতে হইবে। কেবল অধিক পরিমাণে পড়া হইলেই বিদ্যালয়ের কার্য্য ভাল চলিতেছে, পিতামাতার পক্ষেও তাহা মনে করা উচিত নহে। পাঠের আধিক্য দ্বারা কৃতকার্য্যতার পরীক্ষা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণতাই তদ্বিষয়ের নিদর্শন।

বাড়ীতে শিশুগণ কতটা পড়া প্রস্তুত করিতে পারে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে এ কথাটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। শিশুরা বাড়ীতে অতি অল্প কায় করিতে পারে, এই কথা ধরিয়া লইয়া বিদ্যালয়ে তদনুরূপ বন্দোবস্ত না করিলে প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বারা শিক্ষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কোন কোন

শিশুর বাড়ীর অবস্থা এরূপ যে, তাহারা সেখানে অতি অল্প পড়াশুনাই করিতে পারে, কোন কোন শিশু একেবারে কিছুই করিতে পারে না। এ কথা স্বীকার না করা অন্যায়; প্রকৃত অবস্থা যাহা, তদনুরূপ ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। শিক্ষক বিদ্যালয়ে যখন পড়াইতে আরম্ভ করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে শিশুর পড়া তখনই আরম্ভ হয়, এই কথা মনে করিয়া অধ্যাপন আরম্ভ করাই সঙ্গত। এরূপ করিতে হইল বলিয়া শিক্ষকের আক্ষেপ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বরং বাড়ীতে কিছু হয় না, এই কথা মনে করিয়া সমস্ত প্রাথমিক শ্রেণীতে অধ্যাপন করিলেই বিশেষ মঙ্গলের কথা। প্রথম দুই কি তিন বৎসর শিশুর পাঠ-শিক্ষাকে যদি কেবল বিদ্যালয়েই নিবদ্ধ রাখা যায়, তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভব নাই। স্বাস্থ্য এবং শারীরিক পরিণতির অনুরোধে ইহা বাঞ্ছনীয় যে, প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল মস্তিষ্ককে ক্রিয়া করিতে না হয়। বিদ্যালয়ের উত্তেজনা শিশুদিগের বাড়ীতে, এমন কি নিদ্রাতে পর্য্যন্ত যাহাতে পরিব্যাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে শিশুদিগের মস্তিষ্কে অত্যধিক কষ্টকর উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ক্ষুদ্র শিশুদিগের মনোযোগ রক্ষা করিতে যাইয়া যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা হইতে কতক পরিমাণে তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে পারিলেও অনেক লাভ। শিশুদিগের পড়া প্রস্তুত হয় নাই দেখিলে শিক্ষকের মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হয়, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলে সেই অতিরিক্ত শক্তিটুকু অধ্যাপনে নিয়োজিত হইতে পারে। শিক্ষকের মানসিক বিরক্তিতে তাঁহার অত্যধিক বল-ক্ষয় হয়; কিন্তু পড়াটি একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিলে আর বিরক্তির তত কারণ থাকে না। ইহা দ্বারা অধ্যাপন-কার্য্যেও উচ্চতর অভিজ্ঞতা জন্মে। মুখস্থ পড়া কেবল শুনিয়া যাওয়া অতি সামান্য কার্য্য; কিন্তু জ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া স্মরণ রাখিতে পারে, শিশুর মনোবৃত্তিকে এমন ভাবে পরিচালিত করাতে বাহাদুরি আছে, ইহাতে উচ্চতর বিদ্যা এবং নৈপুণ্য প্রকাশ পায়।

এখন মূল প্রশ্ন,—শিক্ষক কিরূপে ছাত্রকে অধ্যয়নে সাহায্য করিবেন? এ প্রশ্নের প্রধান উত্তর এই,—পড়া এমন ভাবে শুনিতে হইবে, যেন সেই পড়াটী ভাল করিয়া জানিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হয়। অধীত পাঠে খুব ভাল ছেলেরও অনেক কথা জানিবার বাকী থাকে; অধিকাংশ বালকেরই জানা অপেক্ষা অজানা কথা অধিক থাকে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, বালকের বুদ্ধি বৃত্তি যত পরিচালিত হইবে, শিক্ষায় ততই আগ্রহ জন্মিতে থাকিবে। অধ্যাপন যত উৎকৃষ্ট হইবে, ততই তাহা অধ্যয়নের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি প্রদর্শন করিবে। ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট কেবল ভাবোদ্রেক মাত্র চায়, ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তিকে স্মরণ-শক্তির সাহায্যার্থ উপস্থিত করে। শিক্ষক আপনার উন্নত জ্ঞান এবং বুদ্ধির সাহায্যে এমন উপায় দেখাইয়া দিবেন,

যাহাতে জ্ঞান-লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে বিশ্লেষণ ক্রিয়া সর্ব্বপ্রধান। জটিল মিশ্রিত বিষয় কিরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানাংশে বিযুক্ত করিয়া লইতে হয়, তাহার বিশুদ্ধ উপায় ছাত্রকে শিখাইয়া দিলে অনেক স্থলের কাঠিন্য আপনা হইতে চলিয়া যায়। ইহাতেও যাহা কঠিন থাকিয়া যায়, তাহা ভালরূপে বুঝিয়া লইলে ভবিষ্যতের নূতন যত্নে সাহায্য হয়। প্রাথমিক ভাষা-শিক্ষায় সরল বিষয় হইতে ক্রমে কঠিন বিষয়ে অগ্রসর হইবার প্রথা যদি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে কিছু দিন পরে এই বিশ্লেষণ-কার্য্য অতি সহজ হইয়া পড়ে। বুদ্ধি-বৃত্তি স্মরণ-শক্তির দ্বার-স্বরূপ। এমন হইতে পারে যে, কেহ কোন বিষয় অতি সুন্দররূপে আবৃত্তি করিতে পারে, অথচ তাহার সে বিষয়টা শিক্ষা হয় নাই। যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত মনে করিতে হইবে শিশু কিছুই শিখে নাই। শিক্ষায় শব্দ-নিবদ্ধ স্মৃতি অপেক্ষা বুদ্ধি-চালিত স্মৃতির অধিক প্রয়োজন। শব্দ-সমন্বয়ের উপরে যে স্মৃতি গঠিত, শব্দ সূত্র ছিঁড়িয়া গেলেই তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু বিষয়-বিশেষ যদি চিন্তা করা যায়, এবং সত্য যদি উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্মৃতি যাহা পায় তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখে, এবং বুদ্ধি-বৃত্তি তাহা কাযে লাগাইতে থাকে। অতএব শিক্ষা-কার্য্যে বিশ্লেষণ-ক্রিয়া সুপরিচিত হইবার নিতান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের নিয়-মিত কার্য্যে নিয়ত ইহার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্ত যথা, শব্দের বর্ণ-বিন্যাসে একটি একটি বর্ণ বা শব্দাংশ পৃথক্ করিয়া যোগান করিতে হয়; ইহাতে বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া শব্দটি মনে রাখিতে এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা মনের সম্মুখে ধরিতে স্মরণ-শক্তিকে বিশেষ সাহায্য করে। এই প্রথাই অশুদ্ধ বর্ণ-বিন্যাসের মহৌষধ। পড়া-সম্বন্ধেও এই কথা। যাহা ভালরূপে বুঝা যায় নাই, তাহা ভালরূপে পড়া অসম্ভব। প্রাত্যহিক পাঠের সময়ে দীর্ঘ-বাক্যগুলি বাছিয়া বিশ্লিষ্ট করিলে এই সহজ এবং অব্যর্থ উপায়ে ছেদ, স্বর, এবং শব্দ বিশেষের উপরে জোর অনায়াসে বুঝা যায়। যে কোন ভাষায় হউক, এবং বালক যতই ধৈর্য্যসহ অধ্যয়ন করুক, কেবল শাব্দিক স্মরণশক্তির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা করা বিড়ম্বনা। কিন্তু সময়ে সময়ে স্মরণ-শক্তি যদি বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্য পায়, তাহা হইলে এই কার্য্যই আমোদজনক হইতে পারে। বাস্তবিক ব্যাকরণের অধ্যাপনে অধ্যাপনা-শক্তির বিলক্ষণ পরীক্ষা হয়। বাক্য-বিশেষের সমস্ত ব্যাকরণ বুঝিতে গেলেই বিশ্লেষণের উপকারিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ব্যাকরণের যাহা আগে পড়া হইয়া গিয়াছে, তাহা না বুঝিয়া থাকিলে বালক ব্যাকরণের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, অতীতের বৃথা পরিশ্রম এবং ভবিষ্যতের বিফল যত্ন ভাবিয়া সে আরও অধীর হয়। ছাত্র-জীবনে অনেক কষ্ট আছে বটে, কিন্তু ইহার তুল্য কষ্টকর আর কিছুই নাই।

অধিকাংশ পিতামাতাই যখন সন্তানদিকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অক্ষম, তখন পড়ার পরিমাণ যতই কম হউক না কেন, ঘন ঘন বিশ্লেষণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিতান্তই প্রয়োজন। নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া চলিতে সময় অধিক লাগিলেও তাহা প্রকৃত উন্নতি; অনিশ্চিতভাবে দ্রুতগতিতে চলিলে বাহিরে উন্নতি দেখা যায় বটে, কিন্তু ভিতরে তাহার ঠিক বিপরীত ঘটে। দূর-বিস্তৃত নিবিড় কণ্টক-বনে জোর করিয়া দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিলে বিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না। অল্পকাল অপেক্ষা করিয়া রাস্তাটি খুঁজিয়া লইলে কষ্ট, পরিশ্রম এবং সময়ের অপব্যয় হার, এ সকল গুলি হইতেই বাঁচা যাইতে পারে। ব্যাকরণকে কণ্টক বন অপেক্ষা ভাল করিবার ভার শিক্ষকের হাতে। অবশ্য কদাচিৎ কোন ছাত্র ব্যাকরণের কাঠিন্যে হতবুদ্ধি হইবে না, কোন শিক্ষকই এমন আশা করিতে পারেন না। কিন্তু কোন শ্রেণীতে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শ্রেণীর অধিকাংশ বালকই যাহাতে তাহা আয়ত্ত করিতে পারে, প্রত্যেক শিক্ষকেরই সে বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত। কেবল বুদ্ধিমান বালকেরা বুঝিয়া লইল, আর অধিকাংশ বালকই বুঝিতে পারিল না, ইহা হইলেই প্রচুর হইল না। বুদ্ধিমান বালকেরা যত ইচ্ছা উচ্চ সংখ্যা পাউক না কেন, এরূপ ফল শিক্ষকের অকৃতকার্য্যতারই চিহ্ন।

সকল প্রকার বিশ্লেষণ-কার্য্যেই চক্ষের ব্যবহার বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ সাহায্য করে। এ বিষয়ে কাষ্ঠ-ফলকের ব্যবহার বিশেষ উপকারী। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ইহাতে বৃথা সময় নষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে অনেক সময় বাঁচিয়া যায়। কেবল মাত্র শব্দ-সাহায্যে উপদিষ্ট বিষয় অপেক্ষা দৃষ্টীভূত বিষয় অধিক সহজে আয়ত্ত হয়। কোন সুদীর্ঘ শব্দ অংশে অংশে বিভক্ত করিয়া কাষ্ঠ-ফলকে লিখিলে তাহা যত সহজে পরিচিত হয়, পুস্তকে মুদ্রিত শব্দ তত সহজে পরিচিত হয় না। এই প্রণালীতে শব্দ বিশ্লেষণে শীঘ্রই অভিজ্ঞতা জন্মে, সুতরাং সর্ব্বদা কাষ্ঠ ফলকের আর দরকার হয় না, কেবল কঠিন কিছু উপস্থিত হইলেই উহার প্রয়োজন হয়। শিক্ষকতা যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আর অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। কাষ্ঠ-ফলকের ব্যবহারে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। মনোবৃত্তিতে প্রবেশের যত প্রকার পথ আছে, তৎসমুদায় যিনি যত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে জানেন, সেই শিক্ষকই শিক্ষা কার্য্যে তত নিপুণ।

শিক্ষা-দানে বিশ্লেষণের পরেই সংযোজনের উপযোগিতা। বালকেরা যাহা শিখিয়াছে, তাহা নূতনভাবে সংযোজিত করিতে যদি উৎসাহ পায়, তাহা হইলে তাহার আনুষঙ্গিক উন্নতিও নিশ্চিত। এই প্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ আলোচনা কোন কোন খেলার ন্যায় বালকদিগের নিকট আমোদজনক। এইরূপ অনুশীলনের সময়ে স্থান-গ্রহণ-জনিত প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বাহ্য উত্তেজনা যদি রহিত করা যায়, তাহা হইলে বুদ্ধি-বৃত্তি স্বাধীনভাবে

ক্রিয়া করিতে পারিয়া বিশেষ উপকৃত হয়। প্রতিযোগিতা রহিত করিতে বলিবার কারণ, ইহাতে, কেহ কেহ যেমন উত্তেজিত হয়, সেইরূপ কাহারও বা বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে দমিয়া যায়। কোন শিক্ষক এ বিষয় সন্দেহ করিলে তিনি অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন; তিনি যদি পরীক্ষার সময়ে প্রত্যেকের মুখের চেহারা লক্ষ্য করেন, এবং কেহ ভুল করিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া সংশোধনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন। ব্যস্ততা এবং বিরুদ্ধভাবের সংমিশ্রণ, এ উভয়ই অনিষ্টকর। সকল প্রকার ভয়েতেই বুদ্ধি জড়তা প্রাপ্ত হয়; শ্রেষ্ঠতা লাভে আশাভঙ্গের যে ভয়, তাহাও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। কিন্তু বালকের মনে যত প্রকার ভয়ের উদ্দীপনা হইতে পারে, তন্মধ্যে দণ্ড লাভের ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর। ইহা বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনের সম্পূর্ণ বিরোধী। মনকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। একটি বালককে কাষ্ঠ ফলকে কোন ক্রিয়ার রূপ করিতে কিম্বা ব্যাকরণের অন্য কিছু লিখিতে দিয়া অন্যান্য বালককে তাহা সংশোধন করিতে বলা, এবং সংশোধিত শব্দগুলি রেখা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সংশোধনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে আদেশ করা অতি উৎকৃষ্ট অনুশীলন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ ভৌগোলিক পণ্ডিত রিটার ভূগোল শিক্ষা-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে এই সংযোজন-ক্রিয়ার দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের সংযোগের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, কেবল পর্ব্বত এবং নদীর চিহ্নসহ মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার পরে ঐতিহাসিক ঘটনা, শিল্প বা উৎপন্ন দ্রব্যের প্রসিদ্ধি অনুসারে অন্যান্য স্থান চিহ্নিত করা কর্ত্তব্য। যেরূপ সংযোজন-ক্রিয়াতে শিক্ষা সহজ এবং আনন্দপ্রদ হয়, রিটারের এই পরামর্শ তাহার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। যাহাতে কেবল কতকগুলি নাম মুখস্থ করিতে হয়, আর কোথায় ইংলণ্ডের এবং কোথায় ফ্রান্সের অধিকার আছে তাহা জানিয়া রাখিতে হয়, সেরূপ ভূগোল-শিক্ষার উপকার অতি অল্প। কিন্তু কোন শিক্ষক কাষ্ঠ-ফলকে কোন দেশের কঙ্কাল-মাত্র অঙ্কিত করিয়া ছাত্রদিগকে যদি ইহার কোন অংশের স্থানগুলি পূরণ করিতে বলেন, আর শেষে মুদ্রিত মানচিত্র খুলিয়া যদি তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে দেন, তাহা হইলে সকলের মনেই তাহা অতি গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে। মানচিত্রাঙ্কনের সঙ্গে কোন প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি সংযোজিত হইলে ইতিহাস-পাঠের আনন্দও বর্দ্ধিত হয়। জর্ম্মনেরা ভূগোল-শিক্ষায় অপর সকল জাতির উপরে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার পরিচয়ের জর্ম্মণ সেনার উপদেশে প্রাপ্তিতে পারে, আবার এই উপদেশের পশ্চাতে যুদ্ধ-নীতিও প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে; কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ব্যাপারটি সত্য। সুপ্রসিদ্ধ প্রুশীয় যুদ্ধের কথায় অনেকে বলেন, জর্ম্মনেরা তথন ফ্রান্সের যতটা ভৌগোলিক

অর্দ্ধেক জানিত, ফরাসীরা নিজে ততটা জানিত না। সৈন্যদিগের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা জর্ম্মনীতে যে পরিমাণে হইয়াছে, সে পরিমাণে আর কোন দেশেই হয় নাই। জর্ম্মনসৈন্য কেবল কাওয়াজ শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; সে রীতিমত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং যুদ্ধ-ক্রিয়ায় অভ্যস্ত। কিন্তু জর্ম্মন বিদ্যালয়ের বালকেরা অতি উৎকৃষ্টরূপে ভূগোল শিক্ষা করে, তাহারা স্থানবিশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পর্য্যন্ত জানিয়া রাখে। গ্রন্থকার বার্লিনে অবস্থানকালে ত্রয়োদশবর্ষীয় কোন বালককে ভূগোল-সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন, বিশেষ বিশেষ স্থান-সম্বন্ধে তাহার যেরূপ জ্ঞান ছিল, যাহারা বিদেশে ভ্রমণ করে না তাহাদের মধ্যে সেরূপ জ্ঞান সচরাচর দেখা যায় না। সেই বালক এডিনবরা নগরের চতুঃপার্শ্বের যেরূপ বিশদ বর্ণনা করিয়াছিল, এডিনবরাবাসী বালকদিগের এক তৃতীয়াংশও বোধ হয় সেরূপ পারিত না। সম্ভবতঃ রিটারের প্রভাবেই বার্লিনের বালকগণ ভৌগোলিক শিক্ষায় এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছিল। এ স্থলে কেবল ব্যাকরণ এবং ভূগোলেরই উল্লেখ হইল, কারণ এই দুই বিষয়ে সংযোজন-ক্রিয়া অতি বিশদভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংযোজন-ক্রিয়া চালাইলে শিক্ষার বিশেষ সাহায্য হয়, এই মূল সত্য শিক্ষার সর্ব্ব বিভাগেই খাটে।

স্বাধীন এবং অনুরক্ত ভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের মনোভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-দ্বয়ের বিশেষ সাহায্য হয়। ইহাতে ছাত্রের কৌতূহল এবং উৎসাহ বিশেষরূপে উত্তেজিত হইয়া থাকে। অত্যধিক মিশামিশিতে শাসন-শক্তি নষ্ট হয়, এবং ইহাতে ছাত্রের মনোযোগে বাধা জন্মে, ইহা সত্য। সকল শিক্ষকই ইহা অবগত আছেন, সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। এ স্থলে যে মনোভাবের কথা বলা হইল, কেবল শিক্ষার সঙ্গেই তাহার সংস্রব। ইহাতে অনুচিত মিশামিশি অসম্ভব। যে কোন বিষয় শিক্ষক ছাত্রের সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহাই শিক্ষার অন্তরায়। যখন যাহা অধীত হয়, কেবল তাহাতেই মনোযোগ নিবদ্ধ থাকিবে, আর কেবল সেই বিষয়েই শিক্ষক এবং ছাত্র স্বাধীনভাবে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবেন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অর্থ। এইরূপ স্বাধীনতা শাসনকে শিথিল না করিয়া বরং দৃঢ় করে। ছাত্র যাহা বুঝিতে না পারে, তাহা অবাধে ব্যক্ত করিতে পারে, আর শিক্ষক তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেন, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কোন কোন শিক্ষক এমন ভাবে শাসন-শক্তির প্রয়োগ করেন যে, তাঁহারা ছাত্রের অভাব জানিতেই পারেন না। তাঁহাদের ভ্রূকুটিতেই জিজ্ঞাসার ইচ্ছা তিরোহিত হয়। এই শ্রেণীর শিক্ষক ছাত্রের শিক্ষা হইয়াছে কি না, ইহা জানিবার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু ছাত্র যাহা বুঝিতে পারে নাই সে বিষয়ে প্রশ্ন করিবার অধিকার তাহাকে দেন না। যখন যাহা শিক্ষা হয়, তাহার সর্ব্বা-

স্বাধীনতার উপরে সমস্তই নির্ভর করে; কিন্তু এস্থলে কেবল শিক্ষকের বিবেচনার উপরেই সর্বাঙ্গীনতার নির্ভর, ছাত্রের অভাব যে কি তাহার সঙ্গে খোঁজই নাই। শিক্ষক যিনিই হউন না কেন, এই প্রণালী যখন নিরাপদ নহে, তখন ইহাকে প্রচুর মনে করা যাইতে পারে না। শিক্ষক যেমনই বিচক্ষণ হউন না কেন, ছাত্রের অভাব পরিজ্ঞাত হওয়া যে তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন, একথা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। এ বিষয়ে কেবল ছাত্রই শিক্ষকের সাহায্য করিতে সক্ষম; কিন্তু যে শিক্ষক সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে ছাত্র হইতে দূরে থাকিবার অভ্যাস করেন, তিনি এ সাহায্য প্রাপ্ত হন না। অধ্যাপন ছুর্ম্মুখেরমত গড়িয়া চলিয়াছে। ছাত্র যদি উপদেশ ধরিতে পারে, তবেত ভালই; কিন্তু সে যদি তাহা বুঝিয়া ধরিতে না পারে, তবে তাহার গত্যন্তর নাই। অন্য প্রণালীতে শাসন দুর্ব্বল হইবে মনে করিয়া যদি এই প্রণালী অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় শিক্ষকের নিজের দুর্ব্বলতা আছে, আর না হয় বিদ্যালয়ের প্রকৃত শাসন কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে, তাহা তিনি জানেন না। ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করিবার সুযোগ না দেওয়া হয়, পরন্তু যখন যাহা বলা হয় তাহা শুনিয়াই যদি তাহাকে সমস্ত শিখিতে হয়, তাহা হইলে ছাত্র-শিক্ষকের সম্বন্ধ নিতান্ত অপ্রীতিকর এবং অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। অন্য কোন অসুবিধা না থাকিলেও পুনঃ পুনঃ স্থান-পরিবর্ত্তনে যথেষ্ট অসুবিধা আছে, এবং এই অসুবিধার জন্য ছাত্রেরা নিজের অজ্ঞতা গোপন করিতে ভাল বাসে। এক শ্রেণীস্থ বালকদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না; প্রতিযোগিতার যে উত্তেজনা জন্মে, তাহার পরিহারও কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহাতে প্রকাণ্ড বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংগোপিত অজ্ঞতারও যেন মূল্য বাড়িয়া যায়, এবং অজ্ঞতা গোপন করা বিদ্যালয়ের একটা নিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। এই বিপদের আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার বলেন, সময়ে সময়ে মনোভাব স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিয়া বালকদিগকে আপন আপন অজ্ঞতাপ্রকাশে উৎসাহিত করা উচিত। যে জিজ্ঞাসার অভ্যাস সকল প্রকার শিক্ষার পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাকে এই উপায়ে উদ্দীপিত করা যাইতে পারে। অন্যত্র যেমন, বিদ্যালয়েও সেইরূপ, আমরা শুষ্ক নিয়ম পরিহার করিতে ইচ্ছা করি। কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কাহাকেও যেন ইহা অনুভব করিতে না হয় যে, পূর্ব্ব দিনে যাহা হইয়াছে, পরদিনেও ঠিক তাহাই হইতেছে। নিদ্রিতাবস্থায় বোবায় ধরা বলিয়া মনে যেরূপ ভয় থাকে, কার্য্যে একতানতা বলিয়াও সেইরূপ ভয় থাকা উচিত। বর্ত্তমান প্রণালীতে বালকেরা মনের কথা বলিতে লজ্জা অনুভব করিতে পারে; যদি সেরূপ হয়, তাহা হইলে তাহাদের মনের কথা বাহির করিয়া তাহাদের অভাব অবগত হইবার উপায় করিতে হইবে। বালক কতটা না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ করিয়াছে, কতটা ভুল বুঝিয়াছে, আর কতটা বুঝা উচিত

হইলেও সে দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই, তাহা অবগত হওয়া শিক্ষকের কর্ত্ত-কার্য্যতার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। (১) আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সাধারণ বিদ্যা-লয়গুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, শিক্ষকের নিকট হইতে যথাসম্ভব প্রতিবিধানের প্রত্যাশা থাকাতে বালকেরা কেমন অবাধ স্বাধীনতার সহিত আপন আপন অভাব জ্ঞাপন করে। গ্রন্থকার আমেরিকাতে কি প্রাথমিক, কি উচ্চশ্রেণীর যত বিদ্যালয় দেখিয়াছেন, সর্ব্ব-ত্রই এই ভাবটা বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া-ছেন। ছাত্রেরা এই ভাবটাকে ছাত্র জীব-নের একটা বিশেষত্ব মনে করে। একদিন আমেরিকার কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে শারীর-তত্ত্বের অধ্যাপক সেইদিনের অধ্যাপন শেষ করিয়াছেন, এমন সময়ে গ্রন্থকার সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অধ্যাপক ছাত্রদিগকে বলিলেন, "আমি অদ্যকার বিষয়ে আগামী কল্য তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব; এখন একবার দেখা যাউক তোমরা যাহা লিখিয়া লইয়াছ, তাহাতে কোন ভুল আছে কি না।" শুনিয়াই একটি ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, মনুষ্য-মস্তকের গড়ে ওজন কত? জিজ্ঞাসামাত্র শিক্ষক বলিয়া দিলেন। তখন একটি একটি করিয়া অনেকটি প্রশ্ন হইল এবং শিক্ষক যথোচিত উত্তর দিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন। এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া শিক্ষক আরও যাহা বলা উচিত মনে করিলেন, অবশিষ্ট যে কয়েক মিনিট সময় ছিল, সেই সময়ের মধ্যে তিনি সেই বিষয়ে উপদেশ দিলেন। আমেরিকার বিদ্যালয়-সমূহে নিত্য যাহা অনুষ্ঠিত হয়, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এই ভাবটি দর্শন করিয়া গ্রন্থকার চমৎকৃত হইয়াছেন। তিনি শুষ্ক নিয়মিত শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার ইচ্ছা, প্রত্যেক শিক্ষক যেন নিজে নিজে পর্য্যবেক্ষা এবং চিন্তা করিবার অবসর পান, শুষ্ক বাঁধা নিয়মে যেন আবদ্ধ থাকিতে না হয়। মানব-প্রকৃতিতে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থাকা চাই; এবং যে সকল উপায়ে মনোযোগকে জাগ্রত ও মানসিক ক্রিয়াশক্তিকে উত্তেজিত করিতে পারা যায়, সে সকল উপায় অবলম্বন করিতে তাঁহার অবাধ স্বাধীনতা থাকা চাই।

---

(১) কিন্তু যে শিক্ষককে ছাত্র বাঘের মত দেখে, ছাত্র কোন প্রশ্ন করিলে যিনি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাহাকে 'নির্ব্বোধ' 'গাধা', 'অমনোযোগী', ইত্যাদি সুমিষ্ট প্রাণতোষিণী ভাষায় তাহার হৃদয়ে গুরু ভক্তির উদ্রেক করিয়া তবে ছাড়েন, সে শিক্ষক কেমন করিয়া ছাত্রের প্রকৃত অভাব জানিবে, আর সে ছাত্রই বা কেমন করিয়া নিজের অভাব তাঁহাকে জানাইবে? ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে, সকলেই আপন আপন ছাত্র-জীবনের কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন, এরূপ অন্ততঃ দুই একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িবে। আমাদের বাল্যকালের এক জন শিক্ষকের কথা স্মরণ আছে,—যে ছাত্র অঙ্ক বুঝিতে পারিত না, সে কিছু না বুঝিয়া অন্যের কসা অঙ্ক নকল করিয়া দিলেও শিক্ষক তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিতেন; কিন্তু কেহ কিছু বুঝিতে চাহিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিত না। এইরূপ শিক্ষক যে ছাত্রের অভাব জানিতে পারেন না, বরং না জানিলেই সন্তুষ্ট থাকেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

চরিত্র-গঠন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কেবল মনোবৃত্তির বিকাশেই সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভাব-বৃত্তির সংযমন —— কর্ম্মের উৎস-নিবহের নিয়মনের বিষয় কথিত হইবে। বালকেরা বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে যাহাতে তাহাদের আচরণকে সংযত করে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে শিক্ষকের কর্ত্তৃত্ব কতদূর, এখন তাহাই দৃষ্ট হইবে। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা গিয়াছে যে, এতদ্বিষয়ে শিক্ষা দান এবং অধ্যক্ষতা শিক্ষকেরই কার্য্য। অধ্যাপকের শিক্ষাকার্য্যের ব্যাপ্তি অতি বিস্তীর্ণ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যতদূর প্রয়োজনীয়, এবং ইহার সাহায্যে যতদূর সম্ভব, ততদূর সমগ্র বালক-প্রকৃতিকে বিকাশিত করিবার ভার শিক্ষকের উপর। জ্ঞানোপধান এবং শিক্ষা-দান, এই দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়, এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উভয়ের বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়ে এক প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে এতদুভয়ই সম্পাদন করিতে হইবে। শিক্ষক একদিকে দেখিবেন, যাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা পর্য্যবেক্ষী, চিন্তাশীল, উপস্থিতজ্ঞানী এবং বৃত্তি-নিচয়ের ব্যবহারে দক্ষ হইতে পারে। আবার তিনি অপর দিকে দেখিবেন, যাহাতে তাহারা ন্যায়বান্, উদার এবং নির্ভীক হইতে পারে। এ উভয়ের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা যে কত, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। বুদ্ধির ধীরতা অপেক্ষা মনের নীচতা যখন নিন্দনীয়, দুর্ব্বল স্মরণ-শক্তি অপেক্ষা স্বার্থপরতা যখন নিন্দনীয়, মূর্খতা অপেক্ষা ভীরুতা যখন নিন্দনীয়, তখন নৈতিক শিক্ষার গুরুতর প্রয়োজন বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে। বাস্তবিক শিক্ষক নৈতিক শিক্ষাকে প্রধান স্থান দিতে পারেন না, কারণ বিদ্যালয়ের সমস্ত বন্দোবস্তই সাধারণ শিক্ষার জন্য ব্যবস্থিত। কিন্তু এরূপ করিবার কোন আবশ্যক নাই, কারণ জীবনের সমস্ত সাধারণ কার্য্যে ভাল করিবার অভ্যাসে যেরূপ নীতি-শিক্ষা হয়, কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কেবল গম্ভীরভাবে উপদেশদ্বারা সেরূপ হয় না। নীতি যে শিক্ষার একটা বিষয়, সে কথা ছাত্রের মনে সর্ব্বদা না থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের সে কথা ক্ষণকালও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ব্যাকরণ, ভূগোল বা ইতিহাস, যাহাই শিক্ষা হউক না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্র গঠিত হইতে থাকে। এ বিষয়ের সত্যতা শিক্ষকেরা এতদূর বুঝিতে পারেন যে, কারি সাহেব তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন,—"যে প্রভাব চরিত্র-গঠনে সাহায্য করে, তৎসমস্তই শিক্ষা।"

পরন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা-দান অপেক্ষা জ্ঞানোপধান অনেক সহজ। এ দুই কার্য্যের নির্ব্বাহ-প্রণালীতেই বিলক্ষণ প্রভেদ রহিয়াছে। যদি কেহ কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে, আর কথঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত যদি সেই বিষয়টি সে অন্যকে বুঝাইতে যায়, তাহা হইলেই সে জ্ঞানোপধানে কৃতকার্য্য

হইবে ; কিন্তু ইহাতে চরিত্র গঠিত হয় না। শিক্ষক সম্ভব পরিষ্কাররূপে নৈতিক নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে, কিন্তু তদনুসারে অনুষ্ঠান কখনই পাইবে না। ফলতঃ এ সম্বন্ধে স্থল-বিশেষে নিষেধ বা উৎসাহের যত প্রয়োজন, বুঝাইয়া দিবার তত প্রয়োজন নাই। এই জন্যই জ্ঞানোপধান একদা বহু জনের পক্ষে চলিতে পারে, কিন্তু শিক্ষা-দানে ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিতে হয়।

শিক্ষা-দানে কৃতকার্য্যতার প্রথম উপকরণ, বালকদিগের বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্গে সহানুভূতি রাখিয়া কঠিন বিষয় বুঝিতে তাহাদিগকে সাহায্য করা, আবার সেই সঙ্গে তাহাদের আচরণ-সংযমনে যত্ন রাখা। কাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব কি, তাহা আগে অবধারণ করিতে পারিলে তবে প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ প্রকৃত সহানুভূতির সম্ভাবনা। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভাল রকমে কায আরম্ভ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে সবদিক্ ভালরূপে দেখিয়া লইবার কত প্রয়োজন। একথাটিও মনে রাখিতে হইবে যে, বালকের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলি যেমন পৈতৃক, তাহার প্রবল ভাবগুলিও সেইরূপ পৈতৃক। এ বিষয়ে যখন মত-বিরোধ নাই, তখন ইহা লইয়া অধিক কথা বলিবারও প্রয়োজন নাই ; কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালনে এ কথাটা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা এ কথাটি স্মরণ না রাখিলে বালকদিগের পক্ষে অন্যায় হইবে, এবং তাহাদিগের সঙ্গে ব্যবহারে যথোচিত বিচক্ষণতাও অবলম্বিত হইতে পারিবে না। কোন বালকের প্রকৃতি উগ্র, কোন বালকের প্রকৃতি মধুর। এই কুল-ক্রম-লব্ধ দোষ বা গুণের জন্য একজনের নিন্দা এবং আর একজনের প্রশংসা অকর্ত্তব্য। হঠাৎ উত্তেজিত হইলে এক বালক যে ক্রোধ-প্রবণতা প্রকাশ না করে, আর এক বালক যদি তাহা করে, তবে ইহাতে বিস্ময়ের ব্যাপার কিছুই নাই। ইহা উভয় বালকের প্রকৃতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। এস্থলে দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, বালক যেন সেই প্রবল ভাবের উপর জয়লাভ করিতে পারে, এবং শিক্ষক যেন তাহাকে তদ্বিষয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু কোন বালক ক্রোধ-প্রবণ প্রকৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া অন্যায়। অনেক সময়ে বালক উত্তেজনা পাইয়া ক্রোধাবিষ্ট হয়, তখন তাহাকে শাস্তি দেওয়াও অল্প অন্যায় নহে। কোন বালক স্বভাবতঃ ভীত, আবার কোন বালক স্বভাবতঃ দুর্দ্দান্ত। কোন্ বালকের কি কি দোষ আছে, তাহা অবধারণ করিয়া যাহাতে বালক তাহা সংশোধন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু তাহা না করিয়া তজ্জন্য বালককে শাস্তি দেওয়া বা অন্য কিছু করা সঙ্গত নহে। হয়ত স্বভাবতঃ কাহারও স্নায়বিক তেজস্বিতা অতি প্রবল, সামান্য পরিবর্ত্তনেই উহা উত্তেজিত হয়, এবং স্নায়ুর উত্তেজনার শেষটা মনও উত্তেজিত হইয়া উঠে। ভীরুতার জন্য বালককে শাস্তি দেওয়া অথবা বিদ্রূপ করা নিতান্ত ভুল ; কেমন করিয়া যে নৈতিক

শিক্ষা দিতে হয়; সে বিষয়ে শিক্ষকের যে জ্ঞান এবং বিবেচনার সম্পূর্ণ অভাব, ইহা তাহারই পরিচয়। আপন তত্ত্বাবধানে অর্পিত কোন বালকের জীবন-ব্যাপী অনিষ্ট করিতে কোন শিক্ষক যদি অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের অনুমোদিত এমন কোন উপায় তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে ভয় কমাইয়া সাহসের বৃদ্ধি করিতে পারে। অন্য আর এক বালক হয় ত স্বভাবতঃ গর্হিত-সাহসী। পূর্ব্ব-বর্ণিত বালক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভয় পায়। এই বালক ভয় পায় না, কারণ সে ভাবিয়া দেখিবার অবসর লয় না; স্নায়বিক উত্তেজনা-জনিত যে প্রতিবন্ধক, তাহা সে অনুভবই করিতে পারে না। সে ভয়ে ভীত হয় না; তাহার দুর্ভাগ্য যে তাহাতে ভয়ের মাত্রা বড়ই অল্প। সে কখনও ভয়ে ভীত বা কম্পিত হয় নাই, কাযেই খাম খুঁটীর সঙ্গে সে নিরর্থক কতই ঠোঁস খায়! একটুকু সাবধান হইলে তাহার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। এই বালকের পক্ষে কঠিন যে কি, তাহা ত বুঝাই যাইতেছে; তাহাকে এমন করিয়া চালাইতে হইবে, যাহাতে চিন্তাশীলতা এবং সাবধানতা তাহার অভ্যস্ত হয়, এবং যাহাতে উত্তেজনা হইতে সে দূরে থাকে।

প্রকৃতি এবং চরিত্রের পার্থক্য অবগত হওয়া শিক্ষা-ব্যবসায়ীর পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক বালকের প্রকৃতিতেই এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহার দমন হওয়া উচিত। এই সমস্ত ভাব উৎকৃষ্ট চরিত্রের উপকরণ হইতে পারে না। এস্থলে নৈতিক বিভিন্নতা প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। বক্তব্য বিষয়টা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, এবং ইহাতে সকলেরই মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষকের কার্য্য যে কত কঠিন, এবং কার্য্য-সাধনের জন্য কখন কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা অবধারণ করিবার জন্য কত সময়ে যে কত গোলযোগে পড়িতে হয়, তাহা ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ-সাধন অপেক্ষা সাবধানতার সহিত কোন্ স্বাভাবিক দোষের সংশোধন অধিকতর কঠিন। অবস্থা বিবেচনা করিয়া অতি সাবধানতার সহিত এ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। ইহাই অভিভাবক এবং শিক্ষকের বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার স্থল। কোন্ অবস্থায় কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবধারণ অসম্ভব।

শিক্ষা-দানে শিক্ষকের শক্তি কতটা, নিশ্চিতরূপে তাহা অবধারণ করিতে পারিলে এ গুরুতর বিষয়ে কার্য্যের কতকটা সুবিধা হইতে পারে। শিক্ষক চরিত্র গঠন করিয়া দিতে পারেন না, কেবল চরিত্র-গঠনের যত্নে ছাত্রকে সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। প্রণালী অবধারণ করিবার পূর্ব্বে এ কথাটি জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। চরিত্র বলিলেই আত্ম-সংযমের বদ্ধমূল অভ্যাস বুঝিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইহার গঠন প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের উপরেই নির্ভর করিতেছে। আদর্শ যাহাই হউক না কেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক যে

সকল অভ্যাস বদ্ধমূল করা যায়, চরিত্র তাহারই ফল। যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক বৃত্তি প্রবল থাকিয়া অবাধে আচরণের পরিচালন করে, সে পর্য্যন্ত চরিত্র-গঠন অসম্ভব। যখন আপন ইচ্ছানুসারে স্বাভাবিক বৃত্তির দমন এবং পরিচালনের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই সময় হইতেই নৈতিক চরিত্রের গঠন আরম্ভ হইল মনে করিতে হইবে। যখনই কিয়ৎ পরিমাণ আত্ম-সংযম লক্ষিত হয়, তখনই তাহা বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাধান্যের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতে হইবে। চরিত্র ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহা ইচ্ছা-শক্তি-নিরপেক্ষ স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বারা গঠিত হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট সচ্চরিত্রের গঠন অতি কঠিন ব্যাপার, ইহার জন্য বহুবর্ষ-ব্যাপী যত্নের প্রয়োজন। বল-প্রয়োগ এই চরিত্র-গঠন-ক্রিয়াকে ব্যাহত এবং সময়ে সময়ে বিপর্য্যস্ত করিয়া ইহার যেরূপ ক্ষতি করে, সেরূপ আর কিছুতেই করিতে পারে না। ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা আচরণ নিয়মিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ; আর সেই ইচ্ছাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার একমাত্র নিরাপদ উপায়, নিজের বুদ্ধি-বৃত্তি, এবং যাঁহারা সহানুভূতি রাখেন ও যাঁহারা নিজের ব্যবহার দ্বারা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই সকল গুরুজন হইতে প্রাপ্ত উৎসাহ।

এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সঙ্গীদিগের প্রভাবে বালকদিগের চরিত্র-গঠনে ব্যাঘাত বা সহায়তা হয়। যদি বয়স্কেরা নৈতিক পার্থক্য-প্রদর্শনে অবহেলা দেখায়, বালকেরাও তাহাই করিবে। সঙ্গিগণ যদি স্বার্থপরায়ণ হয়, আর তাহারা যদি তাহাতে কোন বাধা না পায়, তাহা হইলে বালকেরা সেই জঘন্য বৃত্তিরই অধীন হইবে। মানব-প্রকৃতিতে আত্ম-তৃপ্তি-সাধনের ইচ্ছা এবং আত্ম-সংযমনের বিরক্তি এতই প্রবল যে, সহজ সুখের পথে প্রবৃত্তি দিবার আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আত্ম-সংযমের পক্ষে স্বার্থ-ত্যাগের বা কঠোরতার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাতে যেরূপ যত্নের প্রয়োজন, এবং সেই যত্নের সঙ্গে যতটা কষ্ট-ভোগ করিতে হয়, তাহাতে আত্ম-সংযমের প্রথমাবস্থা একটি ঘোর পরীক্ষার বিষয়। কিন্তু গুরুজন যদি উৎসাহ দেন, আর সঙ্গিগণ যদি সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে যত্ন এবং কষ্টের কঠোরতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। অতএব বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম এবং শাসন-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সাধুতার রক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন হইতে পারে।

যাহা হউক, ছাত্রের বিশুদ্ধ-চরিত্র-সংগঠনে শিক্ষকের যতটা ক্ষমতা আছে, পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্য তাহার একটি অংশ মাত্র। বিদ্যালয়ের শাসন-ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে আপনা হইতেই অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হয়, এবং সেই অবস্থায় সাধু উদ্দেশ্য সকল কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু অনুকূল অবস্থাই একমাত্র প্রয়োজনীয় নহে। বিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সুশাসিত শ্রেণী ছাড়িয়া দিয়া দেখ, অবশিষ্ট বালকেরা স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত আচরণ করিবার সুযোগ পাইলে কি করে। তখন বালক-

দিগের চরিত্র-গত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে, এবং কোন কোন বালককে সঙ্গিদিগের উপর অত্যাচার করিতে দেখা যাইবে। শাসন কর্তৃত্ব হইতেই জন্মে। কিন্তু কেবল কর্তৃত্বের পরিচালনেই চরিত্র গঠিত হয় না। কর্তৃত্ব বা শাসন-শক্তির নিয়ত বাঁধা-বাঁধিতে বরং অনেক সময়ে চরিত্র-গঠনে ব্যাঘাত জন্মে, কারণ নিয়া-পত্তিতে বশ্যতা প্রদর্শন না করিলে অনিবার্য্য শাস্তি শাসন-শক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয়। এ অবস্থায় অনিচ্ছাতে বশ্যতা প্রদর্শিত হয়; কিন্তু অনিচ্ছা-জাত বশ্যতা চরিত্র-গঠনের অনুকূল নহে। ইহাতে বাধ্য-বাধকতায় বিরাগ জন্মে, এবং এই বিরাগের মধ্যে ভাবী অমঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে। শিশুকে চলা শিখাইতে হইবে; যদি সে বিরাগবশতঃ অন্যের বশ্যতা পরিহার করে, তবে সে অসংযত ভাবে চলিয়া বিপন্ন হইতে পারে। অতি উৎকৃষ্ট অঙ্গ-চালন-প্রণালী-তেও চরিত্র-গঠন করিতে পারে না; অতি উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও এ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। অবস্থা যতই অনুকূল হউক না কেন, তাহাতে চরিত্র গঠন করিতে পারে না, কারণ চরিত্র অবস্থার অতীত। মনোবৃত্তির অপরিবর্তনীয় নিয়মানুসারে চরিত্র আপ-নার অভ্যন্তর হইতেই জন্মিয়া থাকে।

চরিত্র-গঠনে সহায়তার জন্য শিক্ষককে প্রত্যেক বালকের বিশেষত্ব অবধারণ করিতে হইবে। এক সময়ে এক বিষয়ে একশত বালককে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চরিত্র-গঠন এ প্রণালীতে হইতে পারে না। কাহার ঝোঁক কোন্ দিকে, কাহার কোন্ বৃত্তি প্রবল, প্রত্যেক বালকে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে কোন শিক্ষকই প্রকৃত রূপে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারেন না। ইহাতে যদি কাষ হয়, তবে কোন চিকিৎসক বহুতর রোগী দেখিয়া যথেচ্ছাক্রমে যাহাকে তাহাকে যে সে ব্যবস্থা-পত্র দিলেও উপকার হইতে পারে। প্রত্যেক ছাত্রের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেহ হয়ত এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে, নিয়মিত শিক্ষা-কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যেক বালক-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সময় থাকে না; কিন্তু শিক্ষক-মাত্রেরই বালকের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভ্যাস রাখা উচিত; যাঁহার এ বিষয়ে অভ্যাস আছে। তিনি জানেন, ইহার জন্য স্বতন্ত্র সময় লাগে না। তিনি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই থাকিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্য্য এবং বালকদিগের গোলমালই তাঁহাকে পর্য্য-বেক্ষার সুযোগ দেয়। বালক যখন স্বাধীন-ভাবে চলিতে পারে না, সুতরাং সাবধান থাকে, সেই সময়ে তাহার সঙ্গে দুইটা কথা বলিয়া যে তাহার চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করা, সে কোন কাযেরই নহে। বালকেরা যখন প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত, সঙ্গীদিগের ক্রোধোদ্দীপক আচরণে উত্তেজিত, অপ্রত্যা-শিত নৈরাশ্যে বিফলীকৃত, এবং ক্রীড়া-ভূমির আমোদে প্রোৎসাহিত হয়, তখন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা

হইলেই প্রত্যেকের প্রকৃতি কিরূপ, এবং প্রত্যেকের জন্য শিক্ষকের কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় পর্য্যবেক্ষা আপনা হইতেই আইসে, অথচ বালক বুঝিতে পারে না যে শিক্ষক তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। এ অবস্থায় সকলই যেন কাষ্ঠ-ফলকে স্পষ্টভাবে লিখিত হয়, কিছুই লুকান থাকে না। এ অবস্থায় শিক্ষক সহজেই বুঝিতে পারেন কে ক্রোধ-প্রবণ আর কে দুর্ব্বত্ত, কে অসমসাহসী আর কে ভয়-সঙ্কুচিত, কে উদ্দেশ্য-গোপন দ্বারা শঠতা করিতে অভ্যস্ত, আর কে আত্ম-প্রাধান্য প্রকাশ করিতে উৎসুক। এই সকল প্রত্যক্ষ করিলেই শিক্ষক বুঝিতে পারেন তাঁহার কার্য্য কি। শিক্ষক তখন জানিতে পারেন যে, এক প্রকার শাসন সকলের প্রতি প্রয়োগ করিলে তাহাতে প্রত্যেকের অভাব ঘুচিবে না। যখন যে প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন, তখন সেইরূপ সাহায্য-দানের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। বিদ্যালয়ের সকলে জানিতে না পারে, হয় ত সেই বালক নিজেও ভাল করিয়া বুঝিয়া না উঠে, এমনভাবে উৎসাহ-সূচক বা ভৎর্সনা-ব্যঞ্জক একটি কটাক্ষ করিলেই বালক আপনার কৃতকার্য্যতা বা অকৃত-কার্য্যতা বুঝিয়া লয়। এরূপ কটাক্ষ-পাতের লিখিত হিসাব বিদ্যালয়ের খাতাপত্রে না থাকিতে পারে, কিন্তু বালকের কমনীয় হৃদয়ে ইহা মুদ্রিত হইয়া থাকে। যাহাকে কথাটি বলিতে হইবে, তাহার কাণের কাছে ঠিক সময় বুঝিয়া মৃদুস্বরে একটি ভৎর্সনার কথা বলিলে তাহাতে বালকের হৃদয়ে উন্নতির জন্য প্রতিজ্ঞা জাগিয়া উঠিতে পারে, এবং সেই সুযোগে শিক্ষক প্রত্যহ বালকের কিছু কিছু উন্নতি করিয়া দিতে পারেন। এইরূপ কথা দীর্ঘকাল মনে থাকে। গ্রন্থকার বলেন, একদিন তাঁহার সহাধ্যায়ী কোন ছাত্রের প্রতি অপর ছাত্রদিগের অত্যাচার দেখিয়া তাঁহার পূজনীয় শিক্ষক বলিয়াছিলেন, "এই বালকদিগের মধ্যে অন্ততঃ এমন একটি বালক আছে, যাহার নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার আমি কখনও প্রত্যাশা করি নাই;" শিক্ষকের সেই কথা এবং সেই দৃষ্টি যেন কল্যকার ঘটনা বলিয়া গ্রন্থকারের মনে হইতেছে। শিক্ষকের সেই কথা এবং সেই দৃষ্টি গ্রন্থকারকেই লক্ষ্য করিয়াছিল; আর সেই মৃদু ভৎর্সনা গ্রন্থকারের হৃদয়ে কেমন গভীর ভাবে বসিয়াছিল, এত দিনের কথা যে এমন উজ্জ্বল ভাবে আজিও মনে রহিয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

যখন বালক উৎসাহ পাইয়া নিজে নিজে আত্ম-সংযমের চেষ্টা করে, তখনই চরিত্র-গঠন আরম্ভ হয়। চরিত্র-গঠন যে বালকের নিজের কার্য্য, এবং এ বিষয়ে যে সর্ব্বদাই যত্ন থাকা উচিত, একথা সে নিজে যেন বুঝিতে পারে। আপনার উপরে মানবের যে শক্তি আছে, বালক যাহাতে তাহা জানিতে পারে, তাহা করিতে হইবে। যে সকল শক্তি মনকে আত্ম-সংযমে পরিচালিত করে, বালককে সে সকল শক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক জাগ্রত করিতে হইবে। আত্ম-সংযমের আনন্দ এবং কঠোরতা, এ উভয়ই

তাহাকে স্বয়ং উপলব্ধি করিতে হইবে। কেবল এই উপায়েই চরিত্র-গঠন সম্ভবপর। অতএব দেখা যাইতেছে, বালককে তাহার নিজের কার্য্যে সাহায্য করা ব্যতীত শিক্ষকের আর অন্য পন্থা নাই। বালক যাহাতে আপন কার্য্যে আগ্রহের সহিত প্রবৃত্ত হয়, তাহা না করিতে পারিলে কৃতকার্য্যতার প্রথম প্রয়োজনই অসিদ্ধ রহিয়া গেল। আচরণ-সংযমনে যে সকল শক্তির প্রয়োজন, আচরণকারীর আপন অভ্যন্তর হইতে সে সকল শক্তি প্রযুক্ত হইলে তবে তাহা ফলদায়ক হয়। যে স্বার্থপরতা হৃদয়ে অনুভব করে, সে নিজে না করিলে আর কে তাহা দমন করিতে পারে? নিজে নিজে দয়া-বৃত্তির প্রশংসা এবং পরিচালনা না করিলে আর কে তাহা মনের ভিতরে জন্মাইয়া দিতে পারে? কি করা কর্ত্তব্য, অন্য লোকে কেবল তাহা বলিয়া দিতে এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিতে পারে মাত্র; কিন্তু প্রকৃত কায বালককে নিজে নিজেই করিতে হইবে। শিক্ষক যেন অত্যধিক চেষ্টা করিতে যাইয়া সমস্ত মাটি না করেন; প্রকৃতপক্ষে যাহা শিক্ষকের শক্তির আয়ত্ত, তাহাতেই তাঁহার পর্য্যবেক্ষা ধৈর্য্য এবং চিন্তাকে ব্যাপৃত রাখিবার বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে। যে কায সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত, তাহা বালককেই করিতে হইবে। যত শীঘ্র বালকের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয়, এবং যত শীঘ্র সে নিজের দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে, চরিত্র-গঠন ততই সহজ এবং ফললাভ ততই নিশ্চিত হইবে।

আত্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সংযম আরম্ভ হয়। মানুষের আচরণ-সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই চিন্তা চরিত্র-গঠনে কার্য্যকরী হইতে হইলে মানুষের বহিরাচরণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তির সঙ্গে ইহার দৃঢ়তর সংশ্রব থাকা চাই।

বালকের মনে কেবল এইরূপ চিন্তাকে উদ্রিক্ত করিয়া এবং তদ্বিষয়ে বালককে উৎসাহিত করিয়াই শিক্ষক আপনার উচ্চতর শিক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষা দ্বারা তাহার সম্যক্ সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু কিরূপ চিন্তার উদ্রেক করিতে হইবে, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। গৃহের কুশিক্ষায় বালকের মন বিকৃত না হইয়া থাকিলে মিথ্যা কথা বলা যে দোষ, একথা বুঝাইবার জন্য তাহাকে উপদেশ দিতে হয় না। ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ প্রতারণা করিলে বালক যত বিরক্ত হয়, এত আর কিছুতেই নহে। এইরূপ, চুরী করা যে অন্যায়, তাহা বালককে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন সচরাচর হয় না; তবে যে বালক একেবারে শিশুকাল হইতে চুরীতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। নিজের কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে কিন্তু সকল বালকেই তৎক্ষণাৎ চেঁচাইয়া উঠে। পিতামাতার ব্যবহার-সম্বন্ধে বালক যতই দুর্ভাগ্যশালী হউক না কেন, দয়া যে একটা ভাল জিনিস, তাহা সকলেই বুঝে। বিদ্যালয়ে আসিবার বহু পূর্ব্বেই বালক ইহা বুঝিতে পারে। ভাল বিষয় জানা অপেক্ষা ভাল কায করাতেই বালকের সাহায্যের অধিক প্রয়োজন;

বিশেষতঃ যখন মন্দ দিকে প্রবল প্রলোভন থাকে, তখন এই সাহায্যের নিতান্ত দরকার। কোন বৃত্তির বেগ প্রবল হইয়া উঠিলে যদি তদ্দ্বারা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই বৃত্তি উত্তেজিত হইবার সময়েই তাহার দিকে যাহাতে বালকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে তাহার সাহায্যের প্রয়োজন। বাহিরে কিছু ঘটিলে তাহাতেই বালকের সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট হয়, ভিতরে যে ক্রোধ ক্রমে ফুলিতে থাকে, সে বিষয়ে তাহার দৃষ্টি থাকে না। চিন্তা-শক্তির পরিচালনে সর্ব্বদা বালকের সাহায্যের প্রয়োজন। চিন্তা-শক্তি বিলম্বে প্রস্ফুটিত হয়, এবং ইহার পরিকর্ষণে বিশেষ যত্ন লাগে। এ বিষয়ে শিক্ষকের সাহায্যের তুলনা নাই; যখনই সাহায্যের প্রয়োজন, তখনই শিক্ষক সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যে মুহূর্ত্তে কাঠিন্য অনুভূত হইল, অমনি শিক্ষকের সাহায্য উপস্থিত। শিক্ষক জানেন, কোন বৃত্তি উত্তেজিত হইবার সময়েই যদি তাহার উপরে মনোযোগ পড়ে, তাহা হইলেই চরিত্র-গঠনের প্রথম উপাদান আয়ত্ত হইল। অতএব কখন কাহাকে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করিয়া, তৎপরতা এবং সহানুভূতি সহ বাক্য, দৃষ্টি, বা অন্য কোন সঙ্কেত দ্বারা সাহায্য করিতে শিক্ষক সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। এইরূপ অবস্থাতেই বালকের আত্ম-সংযমে শক্তি-লাভের কতকটা সাহায্য হইতে পারে। এস্থলে যে সাহায্যের কথা বলা হইল, মানব-প্রকৃতির বিকাশ-সাধনে তাহা অতীব প্রয়োজনীয়, এবং তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধানতার আবশ্যক। এ বিষয়ে নৈপুণ্য বড়ই ইপ্সিতব্য একটি গুণ।

কি কি অবস্থায় বালকের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, উপরি উক্ত কথাগুলি দ্বারা যদি তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, শিক্ষক যে পরিমাণে বালকের শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন, সেই পরিমাণেই তাহার উপকার করিতে তিনি সমর্থ হন। এই শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ না পাইলে শিক্ষক চরিত্র-গঠনে অক্ষম। শিক্ষক যদি নিজে আত্ম-সংযম এবং নৈতিক-শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই শ্রদ্ধা পাইবেন। গম্ভীর প্রশান্ত ব্যবহার প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিচয় দেয়, এবং এইরূপ ব্যবহারে শিক্ষকের প্রতি সকল বালকেরই বিশ্বাস জন্মে। দুশ্চিন্তা-ভারাক্রান্ত দৃষ্টি, মানসিক অশান্তি, ক্রোধ-প্রবণতা এবং ক্রোধোদ্দীপনী, শাসন-প্রণালী, এ সমস্তই বালকের নিকট শিক্ষকের অক্ষমতা প্রকাশ করে, সুতরাং বালকও সেই অক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারে। অনুরাগ-লাভের পক্ষে প্রকৃত সহানুভূতির ন্যায় এমন উপায় আর নাই; প্রত্যেক বালকের নিকট যখন যাহা কঠিন বোধ হয়, শিক্ষক যদি তাহা বুঝিয়া তাহাদিগের সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই অনুরাগ অত্যাসক্তিতে পরিণত হইতে পারে।

ইহাতে বিস্তর উপকারিতা আছে। সুপ্ত অনুরাগকে অনাবিষ্কৃত প্রভাবরাশি মনে করা যাইতে পারে। যখন বিদ্যালয়ের কার্য্য শুষ্ক নিয়মে পরিণত হয়—যন্ত্রের স্থায় প্রত্যহ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলে, তখন ইহাতে সার কিছুই থাকে না; ইহাতে যন্ত্রবৎ নিয়মিত কাযের অভ্যাস হয় বটে, কিন্তু নীতি কিম্বা শিক্ষার অপরাপর উচ্চতম উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ইহা দ্বারা কোন উপকারই হয় না। রাজ-বিধির মতানুসারে পরীক্ষা করিলে হয়ত এ নিয়ম খুবই প্রশংসা পাইবে; খাতাপত্রে যেরূপ লেখা থাকে, তাহা দিয়া বিচার করিতে গেলে হয়ত ইহার শৃঙ্খলা এবং কার্য্যকারিতা খুব অধিকই প্রকাশ পাইবে; কিন্তু নৈতিক বিষয়ে পরীক্ষা করিতে গেলে দেখা যাইবে, ফল অতি অল্পই ফলিয়াছে। কোন নৈতিক দলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কথাটার অর্থ স্পষ্টই বুঝা যাইবে। সৈন্যদিগের কাওয়াজ শিক্ষক কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয়ত অনেক চমৎকার ফল দেখাইতে পারেন; কিন্তু নীতি-বিষয়ে তিনি প্রায় কোন ফলই দেখাইতে পারেন না, হয়ত সে বিষয় চিন্তাও করেন না। অতি উচ্চ অঙ্গের কাওয়াজ-দক্ষতার সঙ্গে অতি নীচ নীতির সমাবেশ অসম্ভব নহে। শিক্ষক যদি উন্নত নৈতিক আদর্শ মনশ্চক্ষে না রাখিয়া এবং সেই আদর্শ হইতে স্খলন আপনার অকৃতকার্য্যতার নিদর্শন মনে না করিয়া কেবল কাওয়াজী নিয়মের দিকেই লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে বিদ্যালয়েও এইরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে। যদি শিক্ষা-কার্য্যে অনুরাগ-শূন্য হইয়া শিক্ষা দিতে আইসেন, যদি বালকদিগের সঙ্গে তাঁহার প্রকৃত সহানুভূতি না থাকে, আর যদি কঠিন প্রস্তর-কর্ত্তৃক ভাস্করের ন্যায় দিবসের কার্য্য ছাড়িতে পারিলেই বাঁচিলেন মনে করেন, তাহা হইলে শিক্ষক সময়-সম্বন্ধে বড় সাবধান হইয়া ——ঠিক ঘড়ির বাড়ি শুনিয়া—চলিলে, এবং অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিলেও উচ্চ দরের শক্তি লাভ করিতে তিনি সমর্থ হন না। যদি শুদ্ধ বানান, ভাল পড়া, যথোচিত আবৃত্তি, উপস্থিত মাত্র অঙ্ক কসা এবং সুন্দর হস্তাক্ষর ছাড়া আর কিছুর প্রতি শিক্ষক লক্ষ্য না রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার আদর্শকে কাওয়াজ শিক্ষকের আদর্শ মনে করিতে হইবে; যে বিশেষজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষক মানসিক সদ্গুণাবলীর বিকাশ-সাধনে সমর্থ, এ সে শিক্ষকের আদর্শ নহে। শিশুদিগের দণ্ডে দণ্ডে মনোযোগের পরিবর্ত্তন, নিয়ত বহমান আমোদ-প্রবণতা, নিরর্থক অথচ প্রবল ভীরুতা, অস্থায়িনী দুশ্চিন্তা, বিরক্তিকর সমস্যা এবং কষ্টকর বিফল-প্রয়াস এ সমস্ত বালকের স্বভাব-সুলভ বলিয়া যদি শিক্ষক তাঁহার মনোযোগের অযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাল-শিক্ষকের প্রকৃত কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি নাই। এরূপ শিক্ষকের পক্ষে দুর্ব্বল অবিকাশিত শিশু-প্রকৃতি হইতে সবল পুরুষ-প্রকৃতি ও সুন্দর স্ত্রী-প্রকৃতি সংগঠন করিবার কঠিন কার্য্য-ভার অন্যের হস্তে দিয়া নিজের পুরুষোচিত ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করা উচিত। যদি কেবল চীৎকার শব্দ, মুষিকাঘাতে অত্যন্ত চরণ, বেত্র, পুস্তক,

ম্যাপচিত্র, কাগজ এবং কলম ব্যতীত শিক্ষা-দানের অন্য কোন উপকরণ তাঁহার হাতে না থাকে, তাহা হইলে তিনি শিক্ষা কার্য্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না। যে সকল প্রসিদ্ধ শিক্ষক উন্নত শিক্ষা-ক্ষেত্রে কার্য্য করেন, তাঁহারা এতদপেক্ষা উন্নত উপকরণ রাখেন। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন স্থলে ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে অর্দ্ধেক সময় নিজে প'ড়ে আর অর্দ্ধেক সময় অন্যকে পড়ায়। পূর্ব্ববর্ণিত শিক্ষক পড়াইবার সম্পূর্ণ সময় পাইলেও ইহাদিগের অপেক্ষা উন্নত নহেন, বরং অধম। শিক্ষক যদি কেবল প্রচলিত উপায়ের উপর নির্ভর না করিয়া ছাত্র কতটা শিখিল, না শিখিল, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে তাহার আত্ম-সংযম এবং জ্ঞান-লাভ উভয় বিষয়েই তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। বালকের ধীরে ধীরে বিকাশমান মনোবৃত্তির পরিচালনে শিক্ষক যদি আনন্দ অনুভব করেন, বালক যাহা গুরুভার মনে করে, তাহার লঘুত্ব-সম্পাদনে শিক্ষকের যদি আমোদ জন্মে, বালকদিগের অব্যাহত আমোদ দেখিয়া যদি তিনি নিজের বাল্য-কালের আমোদ-প্রবণতা স্মরণ করিয়া সুখী হন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের যতটা সাহায্য করিতে পারেন, তাহাদিগকে যতটা শাসিত ও সংযত করিতে পারেন, এবং তাহাদিগের হৃদয়ে যতটা উন্নত ইচ্ছা-বৃত্তির উদ্রেক করিতে পারিবেন; ততটা আর কিছু-তেই পারিবেন না। ছাত্র-জীবনের প্রথমা-বস্থায় চরিত্র-গঠনে কৃতকার্য্যতা যদি লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে গভীর সহানুভূতির একটি স্বচ্ছ স্রোতঃ যাহাতে নিয়ত অব্যাহত ভাবে শিক্ষক হইতে ছাত্রের প্রতি প্রবাহিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। কেবল এইরূপ উপায়েই কার্য্যের কাঠিন্যের লাঘব ও হৃদয়ে সাধু বাসনার উদ্রেক সম্ভব হইতে পারে, কেবল এইরূপ উপায়েই কঠোর কর্ত্তব্যের পথ চিত্তাকর্ষক স্বর্ণ কিরণে আলোকিত হইতে পারে।

চরিত্র-গঠনে বালককে সাহায্য করিতে শিক্ষকের প্রথম কার্য্যই দমন। ভাল কার্য্যে উৎসাহ দান অপেক্ষা মন্দ প্রকৃতির দমন অধিক কঠিন এবং কষ্টকর। কিন্তু উহা হইলেও সৎপ্রবৃত্তিকে বিকাশের অবসর দিবার জন্য অসৎ প্রবৃত্তির দমন করিতেই হইবে। কিন্তু এই দমন কার্য্য কেবল কঠোর বলের সহিত পরিচালিত হইলেই ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, ইহাতে আরও কিছুর প্রয়োজন হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, দমন-ক্রিয়ার যে প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়িনী, দমনীয় বালকের পক্ষে তাহা এক প্রকার উৎসাহ বিশেষ। বাল-কের দ্বারাই তাহার মন্দপ্রবৃত্তির দমন করিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া শিক্ষক যদি নিয়ম-বিধাতা অথবা ভয়োৎপাদক শাসন-কর্ত্তার মত ব্যবহার না করিয়া আত্মীয়ের মত উপদেশ প্রদান করেন, এবং মন্দ বৃত্তির উপরে জয়-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃতকার্য্যতার পক্ষে আর সন্দেহ থাকে না। শিক্ষক যদি কাণের কাছে চুপি চুপি ঠিক উপায়টি বলিয়া দেন, তাহা হইলে ছাত্র জানিতে পারে যে, শিক্ষক তাহার কাঠিন্য বুঝিয়াছেন, ও তাহার পরি-

স্থাপন করিয়াছেন, এবং সে যদি কৃতকার্য্য হইতে পারে, তবে তিনি সন্তুষ্টও হইবেন; ইহাতে ছাত্রের মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা জাগ্রত হয়, এবং যে কার্য্য স্বভাবতঃ নীরস, তাহাতেও আকর্ষণ জন্মে। প্রকৃতিতে বদ্ধ-মূল প্রবৃত্তির দমনে যে বিশেষ কষ্ট অনুভূত হয়, শিক্ষক যেন তাহা কখনও না বিস্মৃত হন। আরব্ধ কোন কার্য্যে শিশু যে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে, যিনি তাহা সুন্দর-রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, শিশু তাঁহাকে একজন যথার্থ সাহায্যকারী বলিয়া মনে ভাবে। কিন্তু কষ্টকর বলিয়া কায হইতে শিশুকে অব্যাহতি দিলে চলিবে না। প্রকৃত চরিত্র-বিকাশের পক্ষে এরূপ কষ্ট-সহন অনিবার্য্য। আত্ম-সংযমে যে স্থিরপ্রতিজ্ঞতা এবং কষ্ট-সহনের প্রয়োজন, তৎপরিহারে বালককে সাহায্য করা তাহার প্রতি দয়া নহে, কিন্তু ঘোর নিষ্ঠুরতা। মানবের পক্ষে এই কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় আছে; সে উপায়টি এই যে, যে পর্য্যন্ত না অভ্যাস দ্বারা কষ্টের লাঘব হয়, যে পর্য্যন্ত না পবিত্র উন্নত সঙ্কল্প জনিত সুখের অনুরোধে এই কষ্টকে উপেক্ষা করিতে পারা যায়, সে পর্য্যন্ত অকুতোভয়ে পুনঃপুনঃ উদ্যম করা। প্রবৃত্তি-বিজয়ের ঘোর পরীক্ষা হইতে বালককে বাঁচাইবার চেষ্টা করা পিতামাতা বা শিক্ষক কাহারও কর্ত্তব্য নহে। দয়ার নাম করিয়া যখন তখন প্রবৃত্তি-তোষণে উৎসাহ দিলেই বালক নষ্ট হয়; এরূপ উৎসাহের জন্য বালকের চিন্তা-শক্তি জাগ্রত হইতে পারে না, প্রবৃত্তি-দমনে যে যুদ্ধের প্রয়োজন তাহাতেও উদ্যম ঘটে না। আপনার নীচ প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে যে কষ্ট হয়, যে সকল পিতামাতা বা শিক্ষক বালককে সেই কষ্ট হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের এরূপ সহানুভূতি দুর্ব্বলতার পরিচায়ক এবং নিতান্ত অনিষ্টকর। ইহা অন্ধ সহানুভূতি; পাশ্চাত্য কবিগণ প্রেমকে যে অন্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন, ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন। কেবল জ্ঞানই প্রেমের প্রকৃত পরিচালক; কেবল মাত্র প্রেম থাকিলেই জীবনকে মহৎ করা যাইতে পারে, ইহার মত ভ্রান্ত সংস্কার আর নাই। যে ভালবাসা প্রবৃত্তি-বিজয়ের কষ্ট হইতে বালককে রক্ষা করে, সে ভালবাসা অল্পকালের মধ্যেই শাসনের অভাব-জনিত দোষগুলিও আর দেখিতে পায় না। অতএব প্রেম যাহাতে অনুচিত মৃদুতার অধোনত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এমন কি, বয়সের অল্পতা মনে করিয়াও যেন প্রবৃত্তি-তোষণে সহায়তা করা না হয়। শিক্ষক দয়া প্রদর্শন করিবার সময়ে সর্ব্বদা যেন এই কথাটি মনে রাখেন যে, বালক যত অল্প বয়সে প্রবৃত্তি-দমনের উদ্যম আরম্ভ করিবে, তত সহজেই সে কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু বালক যখন সাহস করিয়া প্রবৃত্তি-দমনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে হইবে; তবে একথা যেন মনে থাকে যে, প্রবৃত্তি দমন তাহার নিজেরই কার্য্য। প্রকৃত সহানুভূতি দ্বারা বালকের প্রবৃত্তি-দমনে বিশেষ সাহায্য হয়। যে পর্য্যন্ত স্বার্থকে দলন করিবার, ক্রোধকে দমন

করিবার, এবং প্রতিশোধ না লইয়া অন্যায় কার্য্যকে সহ্য করিবার প্রয়োজন থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সহানুভূতির প্রয়োজনও যথেষ্ট পরিমাণেই থাকিয়া যাইবে। এ কার্য্য কোথাও অপেক্ষাকৃত সহজ, কোথাও খুব কঠিন হইবে; কিন্তু যতদূর কঠিনই হউক, তাহা নির্ব্বাহ করা চাই। এজন্য কখন কি করা উচিত, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া শিক্ষকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য। যে সকল শিক্ষক বালকদিগের নৈতিক অভাব বুঝেন, এবং প্রত্যেক বালকের বিশেষত্ব জানেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে অবস্থাপিত বালকেরা বাস্তবিকই সুখী। শিক্ষকে যদি প্রকৃত সাহায্য করিবার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তবে বালকের পক্ষে তাহাই অর্দ্ধেক জয়-লাভ। বালক যতই অল্প বয়স্ক হউক না কেন, তাহাকে সাহায্য করিলে সে তাহা বুঝে এবং তাহার আদর করে; কারণ, এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বয়স্কেরা যে সকল কার্য্যকে সাধারণতঃ দয়ার কার্য্য বলিয়া থাকেন, বালকেরা সে সকল প্রত্যেক কার্য্য এবং তাহাদের ফলের পার্থক্য অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে। বালকদিগের এক প্রকার অনুভাবকতা আছে, তাহার সঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তি অপেক্ষা ভাব-বৃত্তিরই সংস্রব অধিক; সেই অনুভাবকতা দ্বারা তাহারা জানিতে পারে কাহার স্নেহ ক্রমে দুর্ব্বল ও অধোগামী হয়, আর কেহ স্নেহবশতঃ নিজে স্বার্থ-ত্যাগ দেখাইয়া বালককে তাহাতে উৎসাহিত করে। যে শিক্ষক নিতান্ত 'ভাল মানুষ' যিনি সহজ পথে চলিতে বড় ভাল বাসেন, যিনি অনেক নিষেধের কার্য্য দেখিয়াও দেখেন না, যিনি বালকদিগের সকল আবদারেই সম্মত হন, এবং যাহাকে বালকেরা বড় 'মজার লোক,' বলে, তাঁহার প্রতি বালকদিগের এক প্রকার ভালবাসা থাকে। কিন্তু যিনি অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া চলেন, যিনি কোন অসঙ্গত কার্য্যে সম্মত হন না এবং বালকদিগকেও সম্মত হইতে দেন না, তাঁহার প্রতি বালকদিগের শ্রদ্ধা স্বতন্ত্র রকমের এবং অপেক্ষাকৃত গভীর। ভালবাসাকে শাসন-বিধি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি কোমল প্রকৃতি অবলম্বন করা যায়, তাহাতে আত্ম-মর্য্যাদা খর্ব্ব হয়, এবং আত্মসংযমের কাযও কমিয়া যায়; কিন্তু ইহা নিতান্ত বিপজ্জনক। শিক্ষক-প্রকৃতিতে অতিমাত্র মৃদুতা দেখিলে বালকেরা নানা প্রকারে তাঁহার তুষ্টি-সম্পাদন করিতে থাকে, এবং কোন দিন যে অধিকার পায় নাই তাহাও চায়; ইহা আরও অনিষ্টকর। এরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ্য ভাবেই শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে।' যে ধূর্ত্ততা নৈতিক চরিত্রকে বিনষ্ট করে, ইহা দ্বারা তাহা মার্জ্জিত এবং পুরস্কৃত হয়। এই ভাবে শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন না করিয়া, যাহার উপরে নৈতিক চরিত্র গঠিত হইবে তাহা ভাঙ্গিয়া দেন। চরিত্র-গঠনের পক্ষে অবিমিশ্র সাধুতার নিতান্ত প্রয়োজন; বালককে যথোচিত পথে পরিচালিত এবং উৎসাহিত করা যদি প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে অতি অল্প বয়স হইতেই যাহাতে সে নৈতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হয় তাহা করিতে

হইবে। নৈতিক নিয়মও প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয়।

অসদাচরণ দমন করিতে গেলে শিক্ষা-বিষয়ক কতকগুলি জটিল সমস্যা উপস্থিত হয়। কিন্তু সে সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে গ্রন্থকারের ইচ্ছা নাই। যখন যে ঘটনা উপস্থিত হয়, অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা যথোচিত বিবেচনা করিয়া, এবং নৈতিক নিয়ম ও বালকের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা, ইহা ব্যতীত শাসন এবং সহায়তার প্রকৃষ্টতর উপায় আর নাই। এমন অনেক নৈতিক অপরাধ আছে, যাহা অনুষ্ঠিত হইলে এমন ভাবে তাহার জন্য শাসন করিতে হইবে, যাহাতে সে শাসন সমস্ত বিদ্যালয় অনুভব করিতে পারে। শাসন কিরূপ হওয়া উচিত, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মিথ্যা কথন, নির্দ্দয়তা এবং প্রতারণা কখনও যেন বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি না পায়। উচ্চ উদ্দেশ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল শৃঙ্খলার কথা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, এ গুলির নিবারণ না হইলে চলে না। ধরা পড়িলে শাস্তি অনিবার্য্য, এই মনে করিয়া এই সকল অপরাধে বালকের ভয় থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। অন্যায়াচরণের দোষ বালক যাহাতে মনে মনে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা করিতে হইবে। শারীরিক দণ্ডের ভয় এতই প্রবল যে, অপরাধের সময়ে তাহার কথাই আগে আসিয়া বালকের মনে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। শারীরিক দণ্ডের ইহা একটা বিশেষ অসুবিধা। এই অসুবিধা থাকাতেই অপরাধীর মনে অপরাধের দুর্নৈতিকতা বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার প্রয়োজন। শারীরিক দণ্ড সহজেই প্রদান করা যায়; কিন্তু ইহাতে বালকের প্রকৃতি কিছুমাত্র উন্নত না হইতে পারে, হয়ত সে আরও মন্দও হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত অপরাধী কার্য্যের দোষ নিজে দেখিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত সে বিষয়ে তাহাকে চিন্তা করিতে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এরূপ কার্য্যের সমর্থন যে অসম্ভব, অন্যে তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে সে যে কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিত না, পুনঃপুনঃ এরূপ আচরণ করিলে পরিণাম যে ভয়ঙ্কর বিপৎসঙ্কুল হইতে পারে, ইহা তাহাকে নিজে নিজে অনুভব করিতে হইবে। ইহাতে যে সময় যায়, তাহার প্রকৃতই সদ্ব্যবহার হয়। এইভাবে শিক্ষক বালক-চরিত্রের প্রস্তরময়ী দৃঢ়ভিত্তির পত্তন করিতে থাকেন।

সংস্কার-গ্রহণে মনের অসাধারণ শক্তি আছে, এই কথাটা মনে রাখিয়া এমন ভাবে চলিতে হইবে, যেন যথাশক্তি এবং যথা সম্ভব কায হয়, অথচ বালক তাহাতে শিক্ষকের হাত যতদূর সম্ভব অল্প দেখিতে পায়। খুব কড়া হইলেই খুব বেশী ফল পাওয়া যায়, ইহা মনে করা ভুল। মনের প্রকৃতিটা যেন তেজস্যতার একটি কোমল আবরণে আবৃত রহিয়াছে; কঠোরতার সহিত একবার ভয় প্রদর্শন করিলেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। যে কোমল আবরণের উপরে নৈতিক নিয়ম মুদ্রিত করিতে চাহিতেছ, জোরে

হাত দিলে তাহা তখনই নষ্ট হইয়া যাইবে। রহিয়া সহিয়া কায করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। কোন দুর্নৈতিক কার্য্যের উপক্রম দেখিলে, যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, অপরাধীর নামটা উচ্চারণ করিলেই অনেক সময়ে কার্য্যের অপকারিতা তাহার মনে চিরদিনের জন্য গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে সাধারণ পরামর্শ এই, শিক্ষক যদি সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার ভাবে মিথ্যাকথন বা অন্য কোন দুর্নৈতিক কার্য্যের দোষ বুঝাইয়া দেন, আর বালকেরা তাহা শুনিয়া যদি বুঝিতে পারে যে এরূপ কার্য্যে শাস্তি না হওয়াই অন্যায়, তাহা হইলেই শিক্ষকের অনেক লাভ হইল মনে করিতে হইবে। নিস্তব্ধতার মধ্যে ধীর এবং শান্তভাবে কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ কথা বলিলে যে ফল হয়, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও তাহা হয় না।

এইত গেল সাধারণ কথা; কিন্তু বিদ্যালয়ের শাসন-কার্য্যে ইহা অপেক্ষাও কঠিন সমস্যা আছে। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবাধ্য, দুর্ব্বশ্য এবং স্পর্দ্ধনশীল, তাহাদিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন। অনেকে শারীরিক দণ্ডের সম্পূর্ণ বিরোধী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রন্থকার তাঁহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন না। যে কিছুতে উপকার হয়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত বটে, কিন্তু শারীরিক দণ্ডের স্থান পূর্ণ করিতে পারে, এমন কিছু পাওয়া বড় কঠিন। বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া বড়ই গুরুতর দণ্ড; যত দিন সহ্য করিতে পারা যায়, গ্রন্থকারের বিবেচনায় ততদিন তাহা করা উচিত নহে। সায়াহ্ন-বিদ্যালয়ে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ অধিক বয়স্ক ছাত্র অবাধ্য হইলে তাহাকেই তাড়াইয়া দেওয়া উচিত, নতুবা অন্য বালককে সহজে তাড়ান কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে সমস্যার পরিহার হয় বটে, কিন্তু তাহার মীমাংসা হয় না। ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে নিজেরই অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ ভাবে ছাত্রদিগকে নিজের অকর্ম্মণ্যতা জানিতে দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে শিক্ষকের নৈতিক প্রভাব বর্দ্ধিত না করিয়া বরং খর্ব্ব করে। সুযোগ পাইলেই সদয় ব্যবহার অন্যের পরোক্ষে ধীর এবং সহানুভূতিযুক্ত উপদেশ, ধৈর্য্যের জন্য প্রতিশ্রুতি এবং সাহায্যের জন্য প্রত্যাশা, এ সমস্ত উপায়ই যুগপৎ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিয়া অনবস্থাজ্ঞ অপর শিক্ষকের প্রাণের কাল হইতে দেওয়া অপেক্ষা সদয় সহানুভূতি দ্বারা যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহা খাটাইয়া দেখা উচিত। ডাক্তার ইগেল্‌ষ্টোন্‌ আমেরিকার পশ্চিমভাগের অসংস্কৃত ঔপনিবেশিকদিগের বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন; সেই পুস্তকে একটি দুর্দ্দম্য দুর্ব্বশ্য যুবক সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই পড়া উচিত। কথায় কথায় ডাক্তার গথ্‌রির মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিত আর একটি হৃদয়স্পর্শী গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই গল্পটি এই;—"একদল সৈন্য ইংলণ্ডের কোন কেল্লায় অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে সেই সৈন্যদলের একজন কোন অপরাধ

করিয়াছিল। সে অনেক দিনের পুরাতন পাপী, অনেকবার তাহার শাস্তি হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে সে দণ্ড-গ্রহণের জন্য আনিত হইবে, এমন সময়ে তাহার নামের উল্লেখ শুনিয়া একজন কর্ম্মচারী বলিলেন, —'আবার সেই! বেত্রাঘাত, অপমান, কয়েদ, এ সমস্তইত তাহার হইয়াছে!' এই কথা শ্রবণে একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী অগ্রসর হইল, এবং নিজের অনধিকার-চর্চ্চার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'মহাশয়! সব চেষ্টাই হইয়াছে, কেবল একটিমাত্র উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।' সৈন্যাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে উপায় কি?' সে উত্তর করিল, 'মহাশয়! তাহাকে কখনও ক্ষমা করা হয় নাই।' ক্ষমার উল্লেখ শুনিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ যেন চমকিত হইলেন। তিনি কিছুকাল নীরবে চিন্তা করিলেন, তাহার পরে অপরাধীকে ডাকাইলেন, এবং তাহার নিজের বলিবার কিছু আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, 'মহাশয়! আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য দুঃখিত হইয়াছি, ইহা ভিন্ন আমার বলিবার আর কিছুই নাই।' অপরাধী সৈনিক পুরাতন অপরাধী বলিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্দ্ধিত দণ্ড লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষ দয়া এবং প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখ, এবার আমরা তোমায় ক্ষমা করিব মনে করিয়াছি।' সৈনিক এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে অবাক্ হইয়া গেল, তাহার চক্ষে জল আসিল, সে শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল! সে যেন একেবারে মাটি হইয়া গেল, এবং সৈন্যাধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল। সে কি সেই অশাসনীয় পুরাতন পাপীই থাকিয়া গেল? না, সে সেই দিন হইতে যেন আর একজন হইল। যিনি এই গল্প লিখিতেছেন, তিনি বহুদিন ঐ ব্যক্তিকে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার বিবেচনায় সৈনিক পরিচ্ছদে সজ্জিত লোকদিগের মধ্যে ইহার অপেক্ষা ভাল আর কাহাকেও তিনি দেখেন নাই।" এরূপ ঘটনা শতেকের মধ্যে একটি ঘটিলেও তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এস্থলে কিন্তু একথাও বলা উচিত যে, যে ব্যক্তির কথা বলা হইল, অপরাধের অভ্যাসে সে অসাড় হইয়া গিয়াছিল, এবং একবারের ক্ষমায় যদি ফল না হইত, তবে তাহাকে আর কখনও ক্ষমা প্রদর্শন করা যাইতে পারিত না। কিন্তু সদয় ব্যবহারের এতবড় একটা শক্তি আছে যে, কি পরিমাণ তাহার উপরে নির্ভর করা যাইতে পারে, সময়ে সময়ে পরীক্ষা দ্বারা তাহা অবধারণ করা শিক্ষকের পক্ষে কর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়-পরিচালনের সঙ্গে যে সকল নৈতিক বিপদের সম্ভাবনা আছে, সে সকলের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এমন সকল বিপদ আছে, যাহার প্রতিকূলে ছাত্রদিগকে যথাসম্ভব সাবধান করিয়া রাখা নিতান্ত উচিত। ছাত্র-জীবনের প্রতিযোগীতায় হিংসা জন্মিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দৈনিক প্রতিযোগিতা, স্থান-নির্ণয়, পুরস্কারের জন্য সংখ্যাবধারণ, ইত্যাদি সকল বিষয় লইয়া বালকেরা এত উত্তেজিত হয় যে, আত্মসংযমের বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। সম্মান-লাভের জন্য ব্যগ্রতা জন্মিলে

তজ্জন্য কোন অসদুপায় অবলম্বন করিবার প্রলোভন হইতে পারে, আর তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, যে কৃতকার্য্য হয় তাহার উপরে বৈর-ভাব জন্মিতে পারে। প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় প্রচুর উপকার থাকিলেও তৎসঙ্গে যে সকল অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয়ে আমাদের অন্ধ হওয়া উচিত নহে। অনেক ছাত্র একত্র হওয়াতে আপনা হইতে একটা উত্তেজনার ভাব জন্মে, আবার প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক নিয়মিত কার্য্যও যেন একটা আগ্রহ আনিয়া দেয়। এরূপ উত্তেজনা পরিহার করা সঙ্গত বোধ হয় না। আবার এরূপ উত্তেজনা দ্বারা প্রকৃত শিক্ষার কোন সাহায্য হয় না বলিয়া কোন কোন শিক্ষক যে মত প্রচার করিয়া থাকেন, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। উভয় পক্ষের যুক্তি শুনিয়া বিচার করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা করা কঠিন হইবে। গ্রন্থকারের নিকট একটা যুক্তি অকাট্য বলিয়া বোধ হয়। প্রতিযোগ মানবচেষ্টার চির-সহচর। জীবনের এমন বিভাগ নাই, যাহাতে ইহার প্রভাব লক্ষিত না হয়। জীবনের অনেক বিভাগেই প্রতিপদে প্রতিযোগের ফল পরিলক্ষিত হয়। জীবনে ইহা যখন অপরিহার্য্য, তখন বিদ্যালয়ে থাকিতেই ইহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতা-পরিপূর্ণ বিষয়-ব্যাপারে নিমজ্জিত হইয়াও যাহাতে ধীরতা, ন্যায়পরতা এবং সৌজন্য অব্যাহত রাখা যাইতে পারে, সে অভ্যাস হইয়া থাকিলে নিজের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষে অশেষ মঙ্গল। যদি বিদ্যালয় ছাত্রকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করিতে পারে; তাহা হইলে সমাজের যথেষ্ট লাভ। উল্লিখিত বিপদ পরিহার পূর্ব্বক এরূপ শক্তি লাভ করা ছাত্রের পক্ষে প্রার্থনীয়, সুতরাং সর্ব্বদা এ বিষয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে "মহজ্জীবনের শেষ দুর্ব্বলতা" বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করেন; ইহা অসাধু উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলে বলকে দুর্ব্বলতায় এবং মহত্ত্বকে নীচতায় পরিণত করিতে পারে।

জাতীয় অভাবের দূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, জাতীয় প্রধান দোষ কি কি, এবং কি উপায়ে যুবকদিগকে তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত রাখা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষকের মনোযোগ অবিচলিত থাকা কর্ত্তব্য। (১)

---

(১) সকল জাতিরই জাতীয় দোষ আছে, কিন্তু সে গুলি সর্ব্বত্র এক নহে। গ্রন্থকার এস্থলে তাঁহার স্বজাতির কথা বলিতেছেন, কিন্তু খুঁজিলে দেখা যাইবে আমাদিগেরও জাতীয় দোষের অভাব নাই। এই সমস্ত জাতীয় দোষ দূর করিয়া মানবজাতিকে উন্নত ও সুখী করিবার কার শিক্ষকের। এই জন্যই মহাত্মা হিউগো বলিয়াছেন, "মানবজাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষকের হাতে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি রাজা আমাদের দেশে কেহই এ পর্য্যন্ত এ কথার অর্থ বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

অনুবাদক।

যে সকল কর্কশ অসভ্য ব্যবহারে পারিবারিক জীবন অশান্তির আকর হইয়া দাঁড়ায়, এবং যাহার ফল শেষটা মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, যাহাতে বাল্যকাল হইতেই সে সব কাছে আসিতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্কতা চাই। পরিমার্জ্জনকারী-প্রভাবের একটা অব্যাহত স্রোতঃ নিয়ত যেন ছাত্রদিগের মনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। পাঠ্য-পুস্তকে, ইতিহাসে বা বিদ্যালয়ের কোন ঘটনায়—যাহাতে ইহার অনুকূল কিছু পাওয়া যাইবে তাহারই যেন সদ্ব্যবহার হয়। আমাদের সাধ্যায়ত্ত যে কোন উপায় থাকুক, তাহা দ্বারাই ছাত্র-হৃদয়কে মার্জ্জিত এবং উন্নত করিতে হইবে। গভীর শ্যামল দ্রাক্ষা-লতার ঈষদ্রক্তিম আভা যেরূপ, সেইরূপ চরিত্রের কঠোরতায় মৃদুতা অর্পণ করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই উপায়ে বালক কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত জীবন লাভ করে, এবং জীবনের কঠোরতা উপশান্ত করিবার উপযোগী মৃদু-প্রভাব-রূপ অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে। স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে মিশ্রবিদ্যালয় রহিয়াছে, তথায় বালকদিগের পক্ষে বালিকাদিগকে সম্ভ্রম ও সৌজন্য প্রদর্শন করিবার সুযোগ যথেষ্ট রহিয়াছে; ইহার ফল অতি উপকারী এবং দূর-বিস্তৃত। উচিত কার্য্যে উৎসাহ-দানই প্রকৃত শিক্ষা। কর্কশ ব্যবহারই নিন্দার বিষয়; কিন্তু কোন বালক কোন বালিকার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিলে তাহা যে আরও নিন্দার বিষয়, বিদ্যালয়ের সকলেই যেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে আবার এই কর্কশ ব্যবহারের দমন এমন ভাবে করিতে হইবে, যেন বালিকাগণ ভাবিতে না পারে যে, তাহাদিগকে শাসন করিবার নিয়ম অপেক্ষাকৃত অল্প কঠোর, অথবা তাহারা কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার প্রতিবিধান হইবে না। অতি নিপুণতার সহিত এ বিষয়ে তৌল ঠিক রাখিতে হইবে। কোন বালিকা যদি কর্কশ ব্যবহার করে, তবে তাহা আরও অধিক নিন্দার বিষয় মনে করিতে হইবে, কারণ তাহা স্ত্রীজাতির স্বভাব-সিদ্ধ মৃদু এবং বিনম্র প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যিনি প্রকৃত শিক্ষক, তিনি পুরুষকে কর্কশতা হইতে মুক্ত করেন, আর রমণী-প্রকৃতির যে মৃদু সৌজন্য সুফল-প্রসবে পাশব বল হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহাকে অব্যাহত রাখেন। শিক্ষক যখন এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেন, তখন তিনি অতি উন্নত আদর্শ অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষেরা যখন বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন, তখন ইহার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলানুসারে সাহায্যদানের যে প্রণালী বর্ত্তমান আছে, তাহাতে বিদ্যালয়ের হিসাব পত্রে অথবা শিক্ষা-সমিতির খাতায়ও এ ফল লেখা থাকিতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সকল ফল জীবন্তভাবে সমাজে পরিব্যাপ্ত হইবে, এবং ভবিষ্যৎ বংশেও ইহার প্রভাব প্রতিবিম্বিত হইবে; ইহার অতিরিক্ত আমরা আর কি চাই?

যদি কোন জাতীয় দোষের বিরুদ্ধে বালকদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা পান-দোষ। এই দোষের জন্য ইংরাজ জাতি তীব্র তিরস্কার ভোগ করেন; ইহার জন্য ইংরাজ জাতির ক্ষতি এবং দুর্ভোগ যে কত, এ বিষয়ের তৌলিক পরিসংখ্যা যাঁহারা চিন্তা করিয়া না দেখেন তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন না। গ্রন্থকার বলেন, এই ঘৃণাস্পদ পাপ ইংরাজ-জাতির মঙ্গল-সাধনে অনেক বাধা দিতেছে। কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতিগত জীবনে, শারীরিক অত্যাচার এবং বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দীর্ঘ-কাল এক যোগে চলিতে পারে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা এই পান-দোষকে ভয়ঙ্কর-রূপে আক্রমণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতে শিক্ষকেরা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বিশেষতঃ বড় বড় নগরের যে সকল দরিদ্র-পল্লী অত্যুগ্র মদ্য-পানের জন্যই একেবারে রসাতলে যাই-তেছে, সে সকল স্থানে শিক্ষকদিগের প্রতিকূল শক্তি বড়ই প্রবল। কিন্তু শিক্ষক যদি সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, উদ্দেশ্যে অবিচলিত থাকেন, হৃদয়ের সহিত কথা বলেন এবং বিবেচনা পূর্ব্বক বিদ্রূপের পরিহার করেন, তাহা হইলে তিনি অলক্ষিত ভাবে অনেকের হৃদয়ে মদ্যের অনিষ্টকারিতার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারেন, এবং মাতালের জীবনে যে দুঃখ যন্ত্রণা ও পশুত্বের নিদর্শন নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও অজ্ঞাতসারে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে। নৈতিক প্রভাবের একটা প্রবাদ যদি অব্যাহত চলিতে থাকে, আর সুযোগ পাইলেই যদি তদ্দ্বারা পান-দোষের অপকারিতা হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে একটি আত্ম-সংযম-সমর্থ মিতাচারী জাতি অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। পান-দোষ-জনিত সর্ব্বনাশের,—শরীরের অবসাদ ও দুর্ব্বলতা, মানসিক নীচতা, পারিবারিক দুঃখ দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত এতই প্রচুর যে, শিক্ষক সহজে এবং স্বাভাবিক রূপে যখন তখন উল্লেখ দ্বারা ঐ গুলি মনে তুলিয়া দিতে পারেন। এ বিষয়ে এত দুঃখের কথা রহিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে বালকেরা আর মাতালকে লইয়া আমোদ করে না। যিনি বালকদিগের মনে ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সহজেই তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন। কিন্তু পান-দোষের উল্লেখ করিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। এই ভয়ঙ্কর বিষধর কত গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, আর কত বালকের হৃদয় তাহার বিষের জ্বালায় হয়ত ছট্‌ফট্ করিতেছে, শিক্ষকের তাহা স্মরণ রাখা উচিত। স্কট্‌লণ্ডের শিক্ষা-সমিতি কিছু কাল অনুসন্ধান করিতে বসিয়া বড় বড় নগরের যে সকল দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। তাঁহারা এই পান দোষ-জনিত দুরবস্থা সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বাধ্যকরী শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা যে সকল বালককে সেই দুরবস্থা হইতে বাঁচাইবার প্রয়াস হইতেছে, তাহাদিগকে প্রবল প্রলোভনের প্রতিকূলে প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। শিক্ষক যখন তখন মদ্য-পানের দোষ কীর্ত্তন করিতে পারেন বটে, কিন্তু যখনই যাহা বলুন,

তাহাতে যেন শিশুর পবিত্র হৃদয়-বৃত্তিতে আঘাত না লাগে, যেন পিতার প্রতি শিশুর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের মূলে কুঠারাঘাত না হয়, কারণ-তাহা হইলে এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের আরও বৃদ্ধি হইবে।

চরিত্র-গঠনে শিক্ষকের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য সদ্বৃত্তির পরিচালনে উৎসাহদান। এ কার্য্য অপেক্ষাকৃত আনন্দ-জনক। সদ্বৃত্তির পরিবর্দ্ধনই অসদ্বৃত্তি-দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। মহত্ত্বের পরিবর্দ্ধনে নীচতার যেমন ক্ষয় হয়, সেইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে (যাহাতে পুণ্যের জীবন, তাহাতেই পাপের মৃত্যু) অন্যের হৃদ্গত ভাব উপলব্ধি করিবার শক্তি যেমন বর্দ্ধিত হয়, সেই সঙ্গে নিজের কর্কশতা কমিয়া যায়। হৃদয়ে মহত্ত্ব পরিবর্দ্ধিত হইলে স্বার্থচিন্তা উদিত হইবামাত্র লজ্জা আসিয়া তাহাকে বাধা দেয়। সত্যের প্রতি ভাল বাসা থাকিলে সাহস আসিয়া তাহার সাহায্যার্থ দাঁড়ায়, ঘৃণিত মিথ্যার আশ্রয় লইতে দেয় না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিক্ষক বিবেচনা পূর্ব্বক হৃদয়ের সহিত সৎকার্য্যে উৎসাহ দিলে অসদ্বৃত্তির উত্তেজনা অনেক পরিমাণে দমন করিতে পারেন।

অতএব প্রশ্ন হইতেছে, সাধুচরিত্রের উপযোগী সদ্বৃত্তি-নিচয়ের বিকাশ-সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় শিক্ষকের হাতে কি আছে? যেরূপ ভাবের সহিত বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাই প্রথম এবং প্রধান উপায়। যদি বিদ্যালয়ের পরিচালনে সর্ব্বদা সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে বালকেরা অজ্ঞাতসারে তাহারই প্রশংসা এবং অনুকরণ করে। যথেচ্ছাচারিণী শাসন-প্রণালী সাধুতা-বর্দ্ধনের অনুকূল নহে; যে শাসন-প্রণালী ন্যায়-বুদ্ধি এবং সহানুভূতি দ্বারা পরিচালিত, অর্থাৎ যে শাসন-প্রণালীতে নৈতিক মহত্ত্ব আছে, তাহার ছায়াতেই সদ্গুণাবলী স্ফূর্ত্তি পায়। যদি বালকেরা কখনও অন্যায় কিছু দেখিতে পায়, অমনি তাহাদের নীতি-শিক্ষায় বাধা পড়ে। দয়া এবং ন্যায়পরতার প্রভাবে বিদ্যালয় যদি নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে তাহা গ্রহণ করিয়া বালকেরা নৈতিক স্বাস্থ্যও বল লাভ করিবে। এইরূপ প্রভাবের কথা বলাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, শিক্ষক কখনও উদ্দেশ্যের অনুরূপ ফল-লাভে অকৃতকার্য্য হইবেন না। ফলতঃ তাঁহার কৃতকার্য্যতা নীতি-শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। নীতি-শিক্ষার কৃতকার্য্যতার জন্য ব্যক্তিগত পূর্ণতা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। কেবল যাহারা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করে, তাহারা যদি বুঝিতে পারে যে, তাঁহার সম্মুখে একটি উন্নত আদর্শ রহিয়াছে, তিনি সেই আদর্শকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন, আর তাহা লাভ করিবার জন্য যথাশক্তি প্রাণপণে যত্ন করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। এরূপ শিক্ষক পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইলেও তাঁহার প্রতি ছাত্রদিগের শ্রদ্ধা বিচলিত হইবে না, বরং তাহার বৃদ্ধিই হইবে। কথাটা হয়ত সহজে অনেকে বুঝিবেন না; কিন্তু একটুকু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কেহ কোন কার্য্যে ঠকিলে তাঁহার নিজের ত্রুটি স্মরণ করিয়া তিনি যে ভাবে চলেন,

তাহাতে তাঁহার নৈতিক চরিত্রের প্রতি আমাদের যতটা আস্থা জন্মে, সচরাচর যাঁহারা কৃতকার্য্য হন তাঁহাদের উপরে ততটা আস্থা জন্মে না। শিক্ষক-সম্বন্ধে বালকের মত-গঠনে একথাটি বিশেষরূপে খাটে। শিক্ষক যদি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া তাহা অস্বীকার করেন, অথবা কৌশলে তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তখনই ছাত্রেরা তাহা লক্ষ্য করিয়া সে সম্বন্ধে বলা কহা আরম্ভ করে। কিন্তু যিনি নিজে নিয়ম অবধারণ করেন, এবং অন্যে তাহা লঙ্ঘন করিলে সে জন্য তিরস্কার করেন, তিনি যদি নিজের ভ্রম নিজে স্বীকার করেন, অথবা প্রকাশ্য-ভাবে তাহার জন্য অনুতাপ করেন, তাহা হইলে তিনি যে অকপট ভাবে উপদেশ দেন, বালকেরা একথা বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হয়; কারণ তখন তাহারা জানিতে পারে যে, তিনি অন্যকে যাহা করিতে উপদেশ দেন। নিজেও তাহার জন্য যথাশক্তি যত্ন করেন। যদি অনবধানবশতঃ কোন অন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে এবং প্রয়োজন হইলে সকলের সম্মুখে স্বীকার কর, আর তাহার যতটা সংশোধন সম্ভব তাহাও কর। আমরা কেহই সর্ব্ববিষয়ে নির্দ্দোষ নহি; বালক শ্রেণীর সম্মুখে বসিয়া আপনাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করা নিতান্ত ধৃষ্টতা। সময় বুঝিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিলে তাহাতে শিক্ষকের গৌরব খর্ব্ব হয় না। কিন্তু শিক্ষকের নৈতিক উদ্দেশ্য যে উচ্চ, এরূপ দোষ-স্বীকারে যেন তাহাই প্রকাশ পায়,—বালকেরা যেন একথা মনে না ভাবে যে, দুর্ব্বল শিক্ষক দোষ ঢাকিতে না পারিয়া থতমত খাইয়াছেন, এবং অন্য উপায় নাই বলিয়া কষ্টের সহিত দোষ স্বীকার করিতেছেন। ইহাদ্বারা যেন আত্ম-শক্তিই প্রকাশ পায়, আত্ম-দৌর্ব্বল্যের পরিচয় যেন না দেওয়া হয়।

ইহার পরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার শক্তি। শিক্ষক যদি ছাত্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন, এবং তাহাদের প্রকৃত উন্নতি-সাধনে যে তাঁহার ইচ্ছা আছে সে প্রমাণ সর্ব্বদা দিতে পারেন, তাহা হইলে বালকদিগের উপরে তাঁহার অশেষ প্রভাব জন্মিবে। শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হইবার ইচ্ছা সকল বালকেরই আছে; যদি এই ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ অল্পে অল্পে উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হইতে পারে। এই প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্রের প্রশংসা অথবা তিরস্কারে কতকটা কৃপণতা অবলম্বন করিতে হইবে। ছাত্র অবশ্য বুঝিবে যে তাহার আচরণে শিক্ষক সন্তুষ্ট আছেন; কিন্তু তাহার সম্মুখে অন্যের নিকট তাহার প্রশংসা যত অল্প হয় ততই ভাল। চরিত্র-গঠন এতই কঠিন ব্যাপার যে, অত্যন্ত তিরস্কারে যে মন বিপদের আশঙ্কা আছে, অত্যন্ত প্রশংসাতেও সেইরূপ। এ বিপদ দ্বিবিধ,—ভাল কাযের প্রশংসা করিতে যাইয়া অহঙ্কারকে উৎসাহিত করা হয়, আবার বালক নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া মনে করে বড় একটা বাহাদুরি হইল। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত বিপদের সম্ভাবনাই অধিক, এবং

ইহারি লক্ষণ দেখিলেই অমনি মনে হয় ইহার প্রতিষেধ কিছু থাকা উচিত। কিন্তু শেষোক্ত বিপদ লক্ষণদ্বারা সহজে ধরা যায় না, এবং ইহাদ্বারা শীঘ্রই চরিত্র বিপর্য্যস্ত হয়। বালক যেন বুঝিতে পারে যে, সে যাহা করিয়াছে তাহা তাহার কর্ত্তব্যমাত্র, এবং ঐরূপ কার্য্য দিবসে শতবার করিতে তাহাকে বলিলে সে শতবারই তাহা করিতে বাধ্য—সহজে এবং শুদ্ধভাবে কথা বলাতে যেমন একটা বাহাদুরি নাই, সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াও বাহাদুরি মনে করা উচিত নহে। এই বিপৎ পরিহারের জন্যই ইহা বাঞ্ছনীয় যে, বালক নিজের প্রতি শিক্ষকের সন্তোষ যেন বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার মুখে সেই সন্তোষের কথা যতদূর সম্ভব অল্প যেন শুনিতে পায়। অন্য বিষয়ে যেমন, উৎসাহ-দান-সম্বন্ধেও সেইরূপ, চক্ষের দ্বারাই একার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজে সম্পাদিত হয়, অথচ ইহাতে ভ্রম অথবা কুফলের সম্ভাবনা থাকে না। চক্ষের দৃষ্টি অবশ্যই চঞ্চল, ইহা দীর্ঘ কাল একভাবে স্থায়ী থাকিতে পারে না; কিন্তু যতই চঞ্চল হউক, শিক্ষকের উৎসাহসূচক দৃষ্টি বালকের মনে চিরকাল থাকে। এরূপ দৃষ্টি ভূগোলের পড়া অপেক্ষাও অধিক বুঝা যায় এবং অধিক কাল স্মরণ থাকে। পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্যতার জন্য যাহাদের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, বিরক্তিতে হৃদয় অবসন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি না দিয়া দুই একটি উৎসাহের কথা বলিলে উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেই প্রশংসার সুযোগটি যেন স্বাভাবিক হয়। বালক যেন বুঝিতে পারে যে, যে বিষয়ে তাহার প্রশংসা হইতেছে সে বিষয়ে সে প্রশংসা পাইবার যোগ্য; নতুবা তাহার ভাব-বৃত্তির তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইবে, চরিত্রের ক্ষতি হইবে। সর্ব্ববিষয়েই জিনিস খাটি হওয়া চাই। যে প্রশংসার যোগ্য, তাহাকে প্রশংসা করিতে ইতস্ততঃ করিও না। "যে সম্মানের উপযুক্ত তাহাকে সম্মান কর।" কোন বালক যত্ন করিয়াও যদি কিছু করিতে না পারে, আর শিক্ষক যদি গোপনে একবার তাহাকে বলিয়া দেন যে তিনি তাহার যত্নে সন্তুষ্ট আছেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই কথাটির প্রভাব অনেক দিন থাকিয়া যায়। অহঙ্কার প্রশ্রয় পাইতে পারে, এই ভয়ে প্রশংসা না করা কর্ত্তব্য নহে। কোন্ সময়ে এবং কি রূপে প্রশংসা করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করিতে পর্য্যবেক্ষা এবং নিপুণতার প্রয়োজন। অহঙ্কার যাহাতে বর্দ্ধিত না হয় সে দিকে যেমন দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অপ্রকৃত দীনতা যাহাতে পোষিত না হয় সে দিকেও সেই রূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহা নিন্দার যোগ্য তাহাকে নিন্দা করিতে, এবং যাহা প্রশংসার যোগ্য তাহাকে প্রশংসা করিতে সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষক এবং ছাত্র পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব যদি বুঝিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে ভিতরে ভিতরে প্রবল নৈতিক শক্তি দিনে দিনে প্রসারিত হইতে পারে। পাঠাভ্যাসেই হউক, অসৎ প্রবৃত্তির দমনেই হউক, আর যে কোন ভাল কাযেই হউক, যে নিরুৎসাহিত, আর যে উপদেষ্টা কর্ত্তৃক

উপদিষ্ট এবং উৎসাহ প্রাপ্ত, এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। কর্ত্তব্য কার্য্য উভয়ের পক্ষেই তুল্য; কিন্তু যে উৎসাহ পায়, সে প্রফুল্ল চিত্তে কৃতকার্য্যতার আশায় খাটিতে পারে। যাহার ফল অতি ধীরে ধীরে লাভ হয়, এবং যাহার প্রভাব সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত হয়, সেই নীতি-শিক্ষায় যাহার নিজের সংস্রব রহিয়াছে, এমন এক জন বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির (অর্থাৎ শিক্ষকের) সহায়তা অনুভব করিয়া এই শেষোক্ত বালক উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পায়।

প্রত্যহ বিদ্যালয়ে কার্য্যারম্ভের প্রথমে যে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা হয়, বিবেচনার সহিত সম্পাদন করিলে তদ্দ্বারা নীতি-শিক্ষার বিশেষ সাহায্য হইতে পারে (১)। বিলাতের করদাতাগণ এরূপ ধর্ম্মালোচনা নীতি শিক্ষার অনুকূল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে নীতি-শিক্ষার যোগ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এরূপ মত প্রকাশকদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। অভিভাবকদিগের মত বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক কোন শিক্ষা দিতে যে সকল শিক্ষক ইতস্ততঃ করিতেন, বর্ত্তমান আইনের "বিবেক ধারা" নামে একটি ধারা তাঁহাদিগকে সংশয়-মুক্ত করিয়াছে। এখন তাঁহারা সাধারণের ইচ্ছানুসারেই কিঞ্চিৎ ধর্ম্মালোচনা পূর্ব্বক প্রাত্যহিক শিক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন, তবে ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে তাহার জন্যও সুব্যবস্থা রহিয়াছে। নীতি-শিক্ষক এই উপায় দ্বারা মানব-প্রকৃতির গভীরতম বৃত্তি স্পর্শ করিবার অবসর পান। সমস্ত কর্ত্তব্যকে ঈশ্বর-দৃষ্টির অন্তর্নিবিষ্ট করা, এবং বালকের যত্নকে ঈশ্বরের সহায়তা ও সহানুভূতির বিষয়ীভূত করা,—এতদ্দ্বারা জীবন উন্নত এবং যত্ন সহজ ও আনন্দপ্রদ হয়। নৈতিক বৃত্তি এবং ধর্ম্ম-ভাব, মানব-প্রকৃতির এই দুইটি প্রবল শক্তিকে সম্মিলিত করিতে পারিলে যেমন ইচ্ছা কঠোর বিষয়ের যত্নও সহজ হইয়া আইসে। ধর্ম্ম-বিষয়ক যে সকল গভীর প্রশ্ন লইয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই ব্যস্ত, গ্রন্থকার তাহা স্পর্শও করিতে ইচ্ছা করেন না। অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায়, অথবা তদপেক্ষা অধিক মাত্রায়, শিক্ষকও এই সকল প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত থাকা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষকের কর্ত্তব্য কর্ম্মাত্মক, তাহা ভাবাত্মক নহে। বালকের দুর্ব্বল শক্তিতে যতদূর পোষায়, সেই পরিমাণে তাহার সমস্ত প্রকৃতির কর্ষণ করাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভের সময়ে যে ধর্ম্মালো-

(১) ইহা বিলাতের কথা হইতেছে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে এরূপ কোন নিয়ম নাই, বোধ হয় সহজে তাহা হইতেও পারে না; তবে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সর্ব্ববাদিসম্মত স্তোত্র" কি "জয় ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান" ইত্যাদি কোন বাঙ্গালা কবিতা, অথবা মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত "নমস্তে সতে" ইত্যাদি ব্রহ্মস্তোত্র, কিম্বা সহজ সংস্কৃত রচিত অন্য কোন স্তব অবলম্বনে এ কার্য্য হইতে পারে। আমাদের পুরাণাদি পাঠের প্রারম্ভে নানাবিধ বন্দনার নিয়ম আছে, যথা :—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"
ইত্যাদি।

অনুবাদক।

চন্দ্র হয়, তদ্দ্বারা শিক্ষকের উদ্দেশ্য-সাধনে বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। সরল প্রার্থনা এবং ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের জীবন-কাহিনীতে আত্ম-সংযমের শক্তিকে যেমন বর্দ্ধিত করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু অন্য বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও সেইরূপ, ভাল ফল পাইতে হইলে কার্য্যটাও প্রকৃত হওয়া চাই। প্রার্থনায় কেবল নিয়ম রক্ষা এবং ধর্ম্মপুস্তক পাঠে অসাবধানতা প্রকাশ করিলে সুফল ত পাওয়া যায়ই না, বরং অপকার হয়। এরূপ করিলে প্রার্থনা এবং গ্রন্থপাঠের যে প্রকৃত অর্থ, তাহা বালকের মনে প্রবেশ করে না। শিক্ষকের বলিবার ধরণ, কণ্ঠের স্বর, ভাষার গুণ, (১) এ সমস্ত সমবেত ভাবে চিন্তা এবং ভাবকে বালকের মনে বহন করে। পঠিত প্রার্থনা হইতে সুফল পাইতে হইলে প্রার্থনার অন্তর্ভূত প্রত্যেকটি কথা শিক্ষকের ইচ্ছা-প্রণোদিত হওয়া উচিত, এবং তাহা ভাব-বিহ্বল স্বরে প্রকাশ হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মগ্রন্থের পাঠেও সেইরূপ প্রকৃত পাঠ হইবে, অর্থাৎ পাঠ-দ্বারা গ্রন্থোক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রোতার হৃদয়ে নীত হইবে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক যিশুর জীবন এবং মৃত্যুর হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলী পাঠ করিয়া যদি বালকের মনোবৃত্তি এবং আচরণকে তদনুরূপে গঠন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তদনুরূপ দুঃখার্ত্ত স্বরে ঐ গুলি পাঠ করিতে হইবে।

(১) যথা ওজোগুণ, প্রসাদগুণ, ইত্যাদি। অনুবাদক।

—

পঞ্চম অধ্যায়।

শিক্ষকদিগের প্রতি শেষ নিবেদন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং তৎসাধনের উপায়-সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বলা গেল, তাহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষকের কর্ত্তব্যটি নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু শিক্ষকের যদি যোগ্যতা থাকে, তবে তাঁহার নিকট ইহা অপ্রীতিকর হইতে পারে না। যাঁহারা সহজে কায করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যালয়ে না যাইয়া অন্য পথ দেখাই উচিত। যাঁহারা জীবনের কার্য্যে চিন্তা, ধৈর্য্য, এবং অদম্য যত্ন নিয়োগ করিতে উৎসুক, তাঁহারা অধ্যাপন-কার্য্যে আনন্দ পাইয়া থাকেন। শিক্ষকের বাঁধা নিয়মের কার্য্য-সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল এক দিক্ দেখিয়া সে কথা গুলি বলা হইয়াছে। যাহা পড়াইতে হইবে, তাহা বাঁধা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত; কিন্তু কেবল এইমাত্র, ইহার অধিক কিছু নহে। অধ্যাপনে অসীম বৈচিত্র্যের সুযোগ রহিয়াছে।

কখন কৌতূহল, কখন অমনোযোগ, কখন উক্তিমাত্র উপলব্ধি, কখন ভ্রান্ত ধারণা, ইত্যাদি নানা অবস্থার মধ্য দিয়া যে শিশুর মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, ইহাতেই আনন্দের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কখন হাস্যকর এবং কখন বিরক্তিকর অকৃতকার্য্যতা, কখন ক্রীড়াশীল, কখন, চিন্তাশীল, এবং কখনও বা ক্রোধ-দীপ্ত ভাব-প্রবণতা, ইত্যাদি বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া যখন শিশুর আত্ম সংযম বিকশিত

হইতে থাকে, তখন শিক্ষক আপন কার্য্যে বিলক্ষণ আনন্দ লাভ করেন। যখন মনে কোন রূপ নীরস পুনরুক্তির ভাব দাঁড়ায়, তখনই বুঝিতে হইবে অধ্যাপনে কোন ত্রুটি আছে। শিক্ষকের মনে যে উচ্চ লক্ষ্য আছে, আর বহু বালকের একত্র সম্মিলনে বিবিধ প্রকৃতির যে বিচিত্র সমাবেশ হইয়া থাকে, তাহাতে অধ্যাপন-কার্য্য নীরস হওয়া কদাচ উচিত নহে।

অধ্যাপনের মহৎ উদ্দেশ্য জ্ঞানোপধান এবং শিক্ষা, এই দুইটি শব্দদ্বারাই অভিব্যক্ত। শিক্ষক যদি এই দুইটিতে, অথবা ইহার একটিতে অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলেই তিনি উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলেন না। এতদপেক্ষা নিম্নতর কোন উদ্দেশ্য গ্রহণ করিলে অধ্যাপক প্রকৃত অধ্যাপক-পদের অযোগ্য হইবেন। যিনি প্রকৃত শিক্ষক, তিনি কেবল বেতনের মমতাতেই খাটেন না। মানুষ যে কোন বিভাগেই কার্য্য করুক না কেন, সে যদি কেবল বেতনের মমতাতেই খাটে, তবে সে আপনার অধোগতি আপনি আনয়ন করে। কাহার জীবনে নৈতিক বল কত, এই ব্যাপারেই তাহা বুঝা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে বাদানুবাদ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শিক্ষকের গৌরব এবং শক্তি অর্থ-নিরপেক্ষতার উপরে কতদূর নির্ভর করে (১) উক্ত পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের বিচার বিতর্কে কেবল ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু বিলক্ষণ উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ব্যাপারটি তাঁহারা কতদূর গুরুতর বিবেচনা করিতেন। এই সকল তর্কব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের ন্যায় উত্তেজিত না হইয়াও আমরা এখন এ বিষয় বিচার করিতে পারি। জীবিকার জন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা যে কেমন সম্মানের বিষয়, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি; আবার ইহাও বুঝিতে পারি যে, কেবল জীবিকার উপায় করিয়া দেয় বলিয়াই ব্যবসায়-বিশেষের অবলম্বন নীচতার পরিচায়ক। যাহাহউক, সর্ব্ববিষয়েই যাহারা কার্য্য করে তাহাদের যে বেতন বা পুরস্কারের প্রয়োজন হয়, তাহাতে অবলম্বিত কার্য্যের উন্নতি এবং সমাজের উপকার আছে। ইহা স্বীকার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষকের বেতন এমন পরিমাণের হওয়া উচিত, যাহাতে সমাজে তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা হইতে পারে। যদি কোন দেশে শিক্ষকের আয় অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয় সে দেশের লোকের উপযুক্ত উৎসাহ নাই, আর না হয় শিক্ষার প্রকৃত মূল্য তাহারা বুঝে না। স্কটলণ্ডেরও এ দোষ ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে একটা প্রতিবিধান উদ্ভাবিত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষার অধ্যক্ষ-সভা ভাল শিক্ষককে উচ্চ বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন। ভাল শিক্ষকতার জন্য উচ্চ বেতনের ব্যবস্থা হওয়া নিতান্তই উচিত। এখন আশা করা যায় যে, বিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যক্ষ-সভাই অবস্থায় বাধ্য হইয়া এ বিষয়ে পরস্পরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

---

(১) আমাদের দেশে যাহারা ব্রহ্মজীবী বা বেদজীবী ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যাহারা অর্থ লইয়া বেদের অধ্যাপন করে, তাহারা পতিত। অনুবাদক

বেতন অপেক্ষা অন্ত কোন মহত্তর লক্ষ্যে শিক্ষকের দৃষ্টি থাকার নিতান্ত প্রয়োজন। বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা, এবং জীবিকার জন্ত বৃত্তি অবলম্বন করা, এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। পরিশ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের স্বাভাবিক সংযোগ অবশ্যই থাকিবে; কিন্তু যে কোন বিষয়েই হউক, জীবনব্যাপী যত্নের জন্ত যে আর্থিক পুরস্কার, তাহা নিতান্তই অবজ্ঞার বিষয়। যেমন কায তেমনি মজুরী, একথা সকলের পক্ষেই খাটে বটে, কিন্তু কি নিযোক্তা কি নিযুক্ত, যে এই কথার উপর নির্ভর করিয়া সকল কার্য্য করে, সে আপনাকে অতি হীন করিয়া ফেলে। যেমন কায তেমনি মজুরী, একথা বলিতে কায এবং মজুরীর অর্থ কিভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ন্যায়পরতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই যে কথাটি সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক তাহাতে অতি নীচ আদর্শ প্রশ্রয় পায়। প্রকৃত কায বলিতে যাহা বুঝায়, কেবল সময়ের পরিমাণ, শারীরিক বল বা স্নায়বিক শক্তি দ্বারা তাহার যথার্থ নির্দ্দেশ হইতে পারে না। বাঁধা ধরা নিয়মে মজুরের কায চলে বটে, কিন্তু ইহাতেও যেমন কায তেমনি মজুরী, এ ভাবটা সকল সময়ে যথার্থরূপে রক্ষিত হইতে পারে না। মনে মনে কার্য্যের একটা আদর্শ স্থির রাখা, এবং কার্য্য-কালে যতদূর সম্ভব সেই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হওয়া, ইহাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এস্থলে বেতনের উল্লেখ করিবার কারণ, বর্ত্তমান প্রণালীতে শিক্ষকদিগের বেতনে প্রলুব্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ফল দেখিয়া পুরস্কৃত করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও কায দেখিয়া মজুরী দিবার রূপান্তরিত প্রথা মাত্র। ইহা ন্যায়সঙ্গত, এবং কোন সাধারণ বিভাগের পরিচালনে ইহা অনিবার্য্য। কিন্তু ইহাতে উচ্চতর উদ্দেশ্য অনুক্ত থাকে, সুতরাং শিক্ষকের তাহা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা। অতি কদর্য্য প্রণালীর শিক্ষাতেও এরূপ সামান্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যে সকল সূক্ষ্ম এবং মহৎ গুণের উপরে শিক্ষকের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত, এ প্রণালীর অনুসরণ করিলে বিদ্যালয়ে তাহার চিহ্নমাত্রও আর লক্ষিত হয় না। এই মত যতক্ষণ আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে নিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ মন্দ নহে; কিন্তু গণ্ডী অতিক্রম করিলেই ইহা দ্বারা অনিষ্ট হইতে থাকে। এই আর্থিক পুরস্কার প্রণালীর বিষময় ফল হইতে দেশকে রক্ষা করিতে শিক্ষক ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। বাঁধা নিয়মে কার্য্য করা প্রয়োজনীয় বটে; আবার এতদপেক্ষা উন্নততর কোন আদর্শের অনুসরণ না করিলেও আপনার অধঃপতন আপনা দ্বারাই সম্পাদিত হয়। বিদ্যালয়ের পরিদর্শকেরা বাঁধা নিয়মের যথাযথ অনুসরণ হইতে দেখিয়া খুব প্রশংসা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই প্রশংসা-বাদে এই গুরুতর দোষটি ঢাকা থাকিয়া যায়। শিক্ষক বাঁধা নিয়ম ত রক্ষা করিবেনই, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত আরও তাঁহাকে অনেক দূর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বালকদিগকে লেখা, পড়া, এবং অঙ্ক কসা শিখিতে হইবে। শিক্ষা-বিভাগ ইহা চায়, এবং ইহার যথাযথ পরীক্ষাও হইতে পারে। কিন্তু এই সকলের বৃহৎপত্তিতে যাহা বুঝায়, শিক্ষিত বালকদিগকে তদতিরিক্ত আরও অনেক

বিষয় জাতীয় জীবনে সংযোগ করিতে হইবে। শিক্ষা-বিভাগে এই উচ্চতর বিষয়ের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। চরিত্রের পরিস্ফোটন নিয়ম দ্বারা বাঁধা যায় না, অথবা ফল দ্বারাও তাহার পরিমাণ হয় না। শিক্ষার এমন ফল আছে, যাহার উপাদেয়তা বাক্য দ্বারা বর্ণনা হয় না, অথচ যাহার জন্য বিদ্যালয়ের সাহায্যে একটি পয়সাও বাড়ে না। কিন্তু পরিদর্শক যাহা ধরিতে পারেন না, অথবা তিনি যাহা উপেক্ষা করেন, পিতামাতা তাহার উপাদেয়তা উপলব্ধি করিতে থাকেন। শিক্ষা-বিভাগের নিয়মাবলীতে যাহার স্থান হইতে পারে নাই, অধ্যক্ষ-সভা অবশ্য তাহার বিশেষ আদর করিবেন।

কার্য্যের উদ্দেশ্যই তাহার প্রকৃত পুরস্কার। অর্থ দ্বারা যে কার্য্যের পুরস্কার অসম্ভব, তাহার জন্য উচ্চতর পুরস্কার রহিয়াছে। প্লেটো বলিতেন, সুখের অন্বেষণ করা অপেক্ষা ভাল নাগরিক প্রস্তুত করা ভাল; খৃষ্টধর্ম্ম বলে, সর্ব্ববিষয়ে নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে অন্যকে সাহায্য করা আরও ভাল। এ বিষয়ে শিক্ষকের যতটা সাধ্য, অন্যের ততটা সাধ্য নহে। কোন জাতিই শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির পথে অগ্রগামী থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভবিষ্যদ্বংশের চরিত্র গঠন করেন, সেই পিতামাতা এবং শিক্ষকের উপরেই জাতীয় স্থায়িত্ব এবং জাতীয় প্রভাব নির্ভর করে। ফ্রাঙ্কোপ্রুসীয় যুদ্ধের সময়ে লোকে সচরাচরই বলিত যে, জর্ম্মণ শিক্ষকেরাই প্রুসীয়দিগের জয়-লাভের কারণ। এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া গিয়াছিল। জর্ম্মণীর অতি সুশিক্ষিত যাহারা ছিল, তাহারাই সৈন্য-বিভাগে কার্য্য করিত। ইংরাজের সৈনিকবিভাগ সেরূপ নহে; কিন্তু জাতীয় প্রভাব কেবল সৈনিক বিভাগেই নিবদ্ধ নহে,—ইহার মূল আরও গভীর এবং আরও বিস্তৃত। বুদ্ধিবৃত্তির অন্তরালে যে নৈতিক বৃত্তি অবস্থিতি করে, তাহাই জাতীয় জীবনের মূল শক্তি। কিন্তু গ্রন্থকার সৈনিক-বৃত্তি দ্বারা শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিতে চাহেন না। তিনি বলেন, বৃটিশ শিক্ষকেরা যদি জাতীয় দোষ এবং অপরাধের বল ধীর এবং শান্তভাবে রোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে জর্ম্মণদিগের যুদ্ধ জয় অপেক্ষা অধিক আনন্দের কারণ হইবে। দেশের প্রধান শত্রু দেশের মধ্যেই আছে। দেশের যাঁহারা বুদ্ধি বৃত্তির পরিকর্ষণ, আত্ম-সংযম এবং পবিত্র ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই স্বজাতির পরম বন্ধু। শিক্ষকেরা এই শ্রেণীর অগ্রণী। কিন্তু নৈতিক উন্নতিই যে শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, ইহা কেহ যেন বিস্মৃত না হন। যদি কোন শিক্ষক প্রতিবৎসর অনেকগুলি করিয়া ছাত্র পরীক্ষার্থ উপস্থিত করেন, আর তাহার মধ্যে শতকরা ৯০ জন সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি প্রশংসার পাত্র। কিন্তু ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আর একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য এই যে, বালকদিগকে আত্ম-সংযমে এমন অভ্যস্ত করিতে হইবে, যেন গৃহ এবং বিদ্যালয়ের শাসনও সাহায্য সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইলে তাহারা আপনার আচরণ আপনি নিয়মিত করিতে পারে। এরূপ স্থলে বাল্যকালের শিক্ষার ফল ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনে ফলিতে থাকে, সুতরাং তদ্দ্বারা শিক্ষকের পরিশ্রমের সফলতাই প্রকাশ পায়। শিক্ষা-বিষয়ক যত্নের সুফল ইহা অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই হইতে পারে না। শিক্ষকের সমস্ত যত্ন এবং পরিশ্রমের ইহাই প্রকৃত পুরস্কার। শিক্ষক তখন দেখিতে পান, যাহারা বাল্যকালে অনেক বিষয়ে তাঁহার নিকটে উন্নতজীবনের আদর্শ পাইয়াছিল, এখন তাহাদেরই জীবনে সেই উন্নত জীবনের যেন পুনরাবির্ভাব হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহ-শিক্ষা।

বিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষা সম্পাদিত হইতে পারে না। শিক্ষার সমস্ত প্রয়োজন বিদ্যা-মন্দিরে সাধিত হয় না। ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিশেষরূপে অবধারণ পূর্ব্বক প্রয়োজন বুঝিয়া কোন বৃত্তির উত্তেজনা এবং কোন বৃত্তির দমন করিতে যে অন্তঃপ্রবেশিনী শক্তির প্রয়োজন, তাহা গৃহেই যাহাতে মিলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল অভিভাবক শিক্ষার সমস্ত বন্দোবস্তের মধ্যে গৃহ-শিক্ষাকে অতি উচ্চাসন প্রদান না করেন; তাঁহারা গৃহ-শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝেন না। গৃহ-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই বুঝিতে পারা যায় যে, উত্তেজনা বা উৎসাহ-দানই ইহার প্রধান কার্য্য। দমন করিবার, এবং দমিত কার্য্যের মূল অভিপ্রায় ভেদ করিবার শক্তি প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু সর্ব্বদা এ শক্তির পরিচালনা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। যেমন সূর্য্য-কিরণ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া সকলকে আলোকিত করে, সেইরূপ উৎসাহের প্রভাব অবাধে প্রবাহিত হইয়া যেন গৃহস্থিত সকলকে পুলকিত করিতে পারে। মেঘাবৃত আকাশ যত অল্প দেখিতে পাওয়া যায় ততই ভাল। বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত নিরুৎসাহের লাঘব করা, আত্ম-দমনের যত্নে সাহায্য করা, মনকে কার্য্যোদ্যমে সচেষ্ট রাখা, এই গুলিই উৎকৃষ্ট গৃহ-শিক্ষার ফল। আত্ম-সংযমের অভাবে শিক্ষক যেমন, পিতামাতাও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ের কার্য্যের সঙ্গে গৃহস্থালীর বন্দোবস্তের যাহাতে মিল থাকে, তাহা দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। সন্তান শিক্ষায় ভাল শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করিলে সেই সঙ্গে সন্তানের মনে শিক্ষকের প্রতি সম্মান পোষণ করিবার দায়িত্ব-গ্রহণ অনিবার্য্য। কিন্তু এতদ্বিষয়ে ইহা অভিভাবকের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য মাত্র। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে সাহচর্য্যের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীর সঙ্গে গৃহস্থালীর বন্দোবস্তের যতদূর সম্ভব মিল থাকা উচিত। দুই দিকের বন্দোবস্ত সহজেই পরস্পরের বিরোধী হইতে পারে। শিক্ষায় প্রকৃতভাবে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সাধারণ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া গৃহ এবং বিদ্যালয়ের পরস্পর সাহায্যের প্রয়োজন। শিশুর মানসিক এবং নৈতিক বিকাশে বিদ্যালয় যাহাতে আপন প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত করিতে পারে, সে পক্ষে গৃহের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এই প্রসঙ্গে, বিদ্যালয়ের জন্য গৃহে প্রস্তুত হইবার এবং পাঠাভ্যাস করিবার গুরুতর কথা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ে দিনটি গত হইলে পরদিনের জন্য পাঠ অভ্যাস করিতে অপরাহ্নটি কাটিয়া যায়। স্ফূর্ত্তির সময়টা বিদ্যালয়েই কাটিয়া যায়; যখন শিশুগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সহজেই বিরক্ত হয়, এবং শিক্ষা করিতে অনিচ্ছুক থাকে, গৃহ-শিক্ষায় সেই সময়টাই পড়ে। এই ভারে পিতা-

মাতার কর্ত্তব্য-ভার ক্রমশঃ অনিবার্য্যরূপে গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়,সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে, কিরূপে বালকের ভার-লাঘব দ্বারা পিতা-মাতার ভার কমান যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এ বিষয়ের সহায়তা বিদ্যালয় হইতেই প্রধানতঃ প্রত্যাশা করা যায়; কারণ কেবল পড়া লওয়া অথবা বালকের স্কন্ধে ভার চাপাইয়া দেওয়াই শিক্ষকের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। বালকের বয়স কি, এবং সে কতদূর পড়িয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া বালকের দৈনিক পাঠের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। কিন্তু এই দায়িত্বের একটি গুরুতর অংশ পরিবারের উপরে ন্যস্ত। বিদ্যালয়ের নিকটে কতটা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, বিশেষ সাবধানতার সহিত অভিভাবক তাহা যেন বিবেচনা করেন। অবশ্য একটা সঙ্গত পরিমাণের প্রত্যাশা করা যাইতেই পারে; কিন্তু শিক্ষার ফল পরিমাণ দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, অথচ পিতামাতার ঝোঁক পরিমাণের উপরেই অধিক। শিক্ষার ফল অবধারণ করিতে পরিমাণ একটা মোটামুটি উপায় বটে, কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না; কারণ এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন যে, শিক্ষা এবং জ্ঞানোপধানের ক্ষতি করিয়া পরিমাণের আধিক্য দেখান যাইতে পারে। পরিমাণ-সম্বন্ধে খুব অধিক আশা না করাই পিতামাতার উচিত। বালক কোন্ পুস্তকের কত পৃষ্ঠা পড়িয়াছে, অথবা অধীত বিষয়ের সংখ্যা কত, ইত্যাকার বিচার দ্বারা শিক্ষার পরিমাণ হয় না; শিক্ষার পরিমাণ জানিতে হইলে দেখিতে হইবে তাহার কতটা আগ্রহ জন্মিয়াছে, সে কতটা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তাহার আত্ম-সংযম কতটা বাড়িয়াছে। বিষয়ের নূতনত্বের উপরে আগ্রহ নির্ভর করে; বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন হইলেই বুঝা সম্ভব হয়; আর অধিক পরিমাণে ভার না চাপাইলেই তবে আত্ম-সংযম দেখিবার আশা করা যায়। এ কথা গুলি শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়েরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

অধিকাংশ বালকের পক্ষেই বাড়ীতে পাঠাভ্যাস-রূপ কার্য্যটি নিতান্ত কষ্টকর; এই কষ্টের যতদূর লাঘব হইতে পারে, গৃহে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের ছুটির পর কার্য্যের সঙ্গে খেলার সঙ্গত সংমিশ্রণই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। সৌভাগ্যের বিষয় এই, বালকেরা ছুটি পাইলে তাহাদের আমোদের ব্যবস্থা তাহারা নিজে নিজেই করিয়া লয়। কিন্তু যে সকল বালক শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ, বিশেষতঃ তাহাদের জন্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রয়োজন। কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম, যথাসম্ভব নির্ম্মল বায়ু, এবং সাধারণতঃ স্ফূর্ত্তিযুক্ততা, সর্ব্বাপেক্ষা এই গুলিরই বিশেষ প্রয়োজন। খেলার সময়টা স্বাধীন এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত হওয়া উচিত, এ সময়ে বাধাটা যত কম থাকে ততই ভাল। এ কার্য্যটা অতি সহজ বটে, কিন্তু সহজ বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু শরীর যখন ক্লান্ত হয়, আগ্রহ যখন বিচলিত হয়, পাঠ যখন কেবল আংশিক মাত্র অভ্যাস হয়, তখন কি

করিতে হইবে, এ প্রশ্ন এখনও রহিয়াছে। তত্ত্বাবধারক শিক্ষাকারীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। কোন বিষয়ে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে পনর মিনিট তাহা বাদ দিয়া যদি সেই সময়টা বিবেচনার সহিত কোন নূতন কার্য্যে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ইহার পরে একঘণ্টা কাল অনায়াসে পূর্ব্ব কার্য্য করা যাইতে পারে, তাহাতে ক্লান্তি বা বিরক্তি হইবে না। যাঁহারা অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, বিরক্তি দূর করিবার কৌশল তাঁহাদের পক্ষে একটি বিশেষ গুণ। কিন্তু যতই সুবিধা হউক না কেন, বালকদিগকে একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, কাঠিন্য দেখিয়া পলাইলে চলিবে না, কাঠিন্যের সম্মুখীন হইতে হইবে।

এ স্থলে ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য; ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গৃহ এবং বিদ্যালয় উভয়ই সম্মিলিত হইয়াছে। ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয় দ্বারা একটি উচ্চ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু ইহাতেও নানাবিধ অন্তরায় রহিয়াছে। ছাত্রেরা যাহাতে বাড়ীর সুবিধা পায়, বিদ্যালয়ের কঠোর শাসন এবং গৃহ-শাসন ও গৃহ-পাঠের শিথিলতা, এই উভয়ই যাহাকে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়, তাহাই যেন ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য থাকে। এ কার্য্যে অসাধারণ আত্ম-সংযমের প্রয়োজন, এবং শাসন-কার্য্যে অতি নিপুণ শিক্ষকের দ্বারাই ইহা সম্ভব। কঠোর শাসনের শৈথিল্য; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে সম্মতি; যাহাতে কাহারও ক্ষতি হয় না, অথচ সকলেরই আনন্দ হয়, এরূপ আমোদের অনুমোদন; আর বালকদের নিকট যখন যাহা দুষ্কর বলিয়া বোধ হয় তখন তাহাতেই প্রকৃত সহানুভূতি-প্রদর্শন; এই গুলি যিনি দেখাইতে পারেন, মাধুর্য্যমাখা গৃহ-শাসন এবং কঠোর বিদ্যালয়-পরিচালনের শক্তি-সমাবেশ তাঁহাতে আছে।

পিতামাতার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে এ কথা বলা উচিত, বালকেরা যাহাতে ভালরূপে পড়া প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। অসম্পূর্ণভাবে পাঠ প্রস্তুত করিবার আশঙ্কা খুব বেশী। ইহার পরিহার করিতে হইলে যত্ন অনিবার্য্য। শৈশবে যখন অভ্যাস গঠিত হইতে থাকে, সেই সময়ে এ যত্ন করিলে তাহা বিফল হয় না। পাঠ্য বিষয় যখন কঠিন হয়, তখন পিতামাতার ধৈর্য্য এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। যাহার মন পাঠে আমোদ পায় এবং তাহাতে সহজে নিবিষ্ট হয়, তাহার উপর তত্ত্বাবধানের তত প্রয়োজন নাই; কিন্তু পাঠে যে আমোদ পায় না, এবং পাঠ অভ্যাস করিতে যাহার বিশেষ সময় লাগে, তাহার পক্ষে তত্ত্বাবধান এবং উপদেশের বিশেষ দরকার। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ফলদায়িনী প্রণালী এই যে, অভিভাবক (অথবা গৃহ-শিক্ষক) শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব নিজেও শিক্ষার্থী হইবেন। কেবল পড়া মুখস্থ করা বিদ্যালয়ে যেমন, বাড়ীতেও সেইরূপ নিরর্থক শ্রম হইতে পারে। মুখস্থকারী ছাত্র জানে যে, সে কিছুই শিখিতেছে না; তাহার

অভ্যন্তরস্থ ব্যবস্থা অভিভাবকের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িলে তিনিও ইহা বুঝিতে পারেন। প্রথমাবস্থা হইতে বালকের সঙ্গে শিক্ষা আরম্ভ করাই প্রকৃষ্ট উপায়; স্মরণ-শক্তিকে দৃঢ় করিবার সঙ্কেত বলিয়া দিলে এবং যাহাতে বুঝিবার সুবিধা হয় এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিলে বালক অধীতব্য বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে। শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিবার এরূপ প্রণালী নিরর্থক শ্রম-সঙ্কুল বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক এই প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল-প্রদ।

বালকের পাঠাভ্যাসে সাহায্য করা এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাড়ীর বন্দোবস্তের মিল রাখা, ইহা ছাড়া প্রকৃত গৃহ-শিক্ষার ব্যাপার আরও বিস্তৃত। বালকের শক্তি-নিচয় উত্তেজিত এবং বিকাশিত হইতে পারে, এমন ভাবে বালক-জীবন পরিচালিত করিতে পিতামাতার যে প্রভাবের প্রয়োজন, এখন তাহাই বিবেচ্য। এ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই মনে মনে একটা স্থির মতলব, অথবা বিবেচনা পূর্ব্বক একটা অবধারণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমোদ-প্রমোদ-সম্বন্ধে, কিছুই যে অধিক ভাল নহে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। বাধা দিতে হইবে বটে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বাধাতেও ক্ষতি আছে। পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বালক প্রতিপদে বাধা পায়, ইহা কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। পক্ষান্তরে আমোদ প্রমোদের প্রণালী-নির্দ্ধারণ এবং আমোদার্থ সময়ের পরিমাণাবধারণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নিজে নিজে আমোদ প্রমোদ নিয়মিত করিতে এবং প্রয়োজন বুঝিয়া তাহা হইতে বিরত থাকিতে যদি বালককে শিখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে অনেক শিখান হইল। সাধারণ আচরণ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উচিত বিষয় নিজে নিজে স্বীকার করিয়া লওয়াই প্রধান লক্ষ্য; পিতামাতা সন্তানকে এ বিষয়ে যে পরিমাণে সাহায্য করেন; তাঁহাদের প্রভাব সেই পরিমাণে মূল্যবান্। বালকের উপরে কর্তৃত্ব থাকিবে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কর্তৃত্ব বিপজ্জনক হইতে পারে। এ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, কর্তৃত্ব যেন কর্ত্তার বুদ্ধি-সম্মত হয়, এবং বালক যখন স্থির ও নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিবে, তখন যেন ইহার যুক্তিযুক্ততা সে বুঝিতে পারে। প্রবৃত্তির অধীনতা ছাড়িয়া বুদ্ধিবৃত্তির অধীন হওয়া অতি কঠিন, এবং ইহাতে বিশেষ সময় লাগে; কিন্তু পিতামাতার শাসনে বাল্যকালেই এ বিষয়ের চেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে, এবং পিতামাতা বিবেচনাও সহানুভূতির সহিত সাহায্য করিলেই এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হইবে। বালকের নিকট কোন্ বিষয় কত কঠিন, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে, কিন্তু বালকের ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে না। এই কঠিন কার্য্যে পিতামাতা এবং সন্তান উভয় পক্ষেরই অনেক সময়ে অনেক ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু এ বিষয়ের কৃতকার্য্যতা পারিবারিক সুব্যবহারের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যেমন মানবের বাস-ভূমি ধরণীকে বায়ু-মণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ

সমস্ত গৃহ-কার্য্যেই যেন ধর্ম্ম এবং নীতির প্রভাব প্রবাহিত হইতে থাকে। একটি শেষ নির্ভরের স্থল, একটি সন্দেহ-বিহীন নিশ্চয়তা, একটি অবিসংবাদিত প্রভুতা সকলেরই আশ্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয়; মানুষের সদাচার-বিধানে এবং ঈশ্বরের দয়াও ন্যায়-যুক্ত শাসনে এই গুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন রাজ-শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ ধরা যায়, তখন দেখা যায় পিতা-পুত্র এক-ভূমিতেই দণ্ডায়মান। কিন্তু উচ্চতর শক্তির কর্ত্তৃত্বে নিয়ত বাধ্য থাকিয়াও পিতামাতা আপন আপন শাসন-শক্তি নিরাপদে পরি-চালিত করিতে পারেন। এই প্রণালীর পারিবারিক শাসনে মনের মধ্যে শান্তি এবং নিরুদ্বেগতা স্থান পায়, কারণ ইহাতে মোটের উপর এইটা জানা থাকে যে, অব্যবস্থিত-চিত্ততা অথবা ক্রোধাদি-জনিত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে না। প্রকৃতি-সিদ্ধ স্নেহ ছাড়া আরও কোনও সুস্পষ্ট নিয়ম পিতামাতার জানা থাকা কর্ত্তব্য। স্নেহ সকল অভাব দূরে করিবে, যত লোকেই এ কথার সমর্থন করুক না কেন, ইহা একটি ভুল। স্নেহ প্রিয়পাত্রের মঙ্গল চায় বটে; কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল যে কি, তাহা অবধারণ করা বুদ্ধি-বৃত্তির কার্য্য। শ্রদ্ধাদ্বারা স্নেহকে পরিবেষ্টিত এবং সংযত রাখা কর্ত্তব্য, কারণ স্নেহও নিয়মের অধীন; পরন্তু স্নেহ অনিয়মিত বা কুনিয়মিত হইলে তাহাতে স্নেহ-পাত্রের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তিও স্নেহ-বৃত্তিকে সম্মিলিত করাই মানব-প্রকৃতির চরম উৎকর্ষ, এবং ইহা দ্বারা পারিবারিক শাসন ও অতি উৎকৃষ্ট এবং উপকারী হইয়া থাকে। এরূপ করিলে সন্তানেরা পিতামাতাকে সঙ্গী এবং বন্ধুর মত মনে করিবে, এবং যদ্দ্বারা নর-নারী জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতে পারে, সেই চরিত্রের দিকে তাহারা আপনা হইতে আকৃষ্ট হইবে।

পিতামাতার সর্ব্বতোমুখী প্রভাব যদিও শিক্ষার প্রধান উপকরণ, কিন্তু পারিবারিক আহার-ব্যবস্থা শিক্ষোন্নতি বিধানের একটি সুন্দর সুযোগ। পারিবারিক আহার-স্থালী(১) একটি সভাবিশেষ; এখানে সকলেই

(১) আহার-স্থালী বা টেবিল-সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইতেছে, তাহা ইংরাজ-সমাজের কথা। ইংরাজেরা টেবিলের চারি ধারে সকলে একত্র বসিয়া আহার করেন। কাযে কর্ম্মে থাকাতে অন্য সময়ে দেখা সাক্ষাৎ দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু এ সময়টায় সকলের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হয়। গান, বাদ্য, গল্প, আমোদ-প্রমোদ, হাসি-তামাসা, সংবাদপত্র-পাঠ, রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতির সমালোচন, ইত্যাদি বিষয়ের প্রধান সুযোগ আহারের সময়। ভোজ বা নিমন্ত্রণের আহার বিনাবক্তৃতায় হইতেই পারে না। আমাদের রীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মৌনী এবং অনন্য-চিত্ত হইয়া আহার করাই আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যেরও অনুকূল; কিন্তু কার্য্যতঃ সেরূপ সর্ব্বত্র না হইলেও ইংরাজের মত অতটা বাড়াবাড়ি হইতে পারে না। উভয় প্রণালীর তুলনা এবং সমালোচন এস্থলে অসম্ভব; তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের প্রণালী

স্বাধীনভাবে কথা কহিতে পারে, এখানে গাম্ভীর্য্য স্থান পায় না, এখানে কথায় কথা উঠে এবং সংসারের সকল কথারই আলোচনা হয়, আর এই উপলক্ষে বালককে শিক্ষা দিবারও বেশ সুযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষা-শক্তি-পরিচালনের জন্য যে আত্মীয়ভাবের নিতান্ত প্রয়োজন, এস্থলে তাহা সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায়; মনের ভাব অবাধে প্রকাশিত হয়, আবার অন্যের কথাগুলিও মনের মধ্যে বসিয়া যায়; সেই সঙ্গে স্মৃতিকে জাগ্রত এবং চিন্তা-শক্তিকে উত্তেজিত করিবার সুযোগ হয়, অথচ তখন কেবল কথাবার্ত্তাই চলিতে থাকে, সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে শিক্ষা-দানের গাম্ভীর্য্য অনুভূত হয় না। পারিবারিক ভোজন-স্থালীর প্রকৃত ব্যবহার জানিলে ইহা দ্বারা শিক্ষার বিশেষ সাহায্য হয়। অনেকের নিকট এ কথাগুলি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু আমরা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের যে কত অনাদর করি, আর সাক্ষাৎসম্বন্ধে শিক্ষা না দিলে শিক্ষা হয় না, এই ভ্রান্ত মত যে পোষণ করি, এরূপ অসঙ্গতি-বোধ তাহারই প্রমাণ। যে শিক্ষা শিক্ষা বলিয়া বোধ হয় না, বালকদিগের নিকটে সে শিক্ষার প্রভাব যত অধিক, এত আর কিছুই নহে। যে বালক তাহার সঙ্গীর নিকটে কোন কৃতকার্য্য বর্ণনা করে, অথবা কোন ভবিষ্যৎ সুখ চিত্রিত করে, তাহার প্রভাব কত অধিক। খেলার সময়ে কেহ অনুচিত ভাবে চলিলে, একজনের অসুবিধা করিয়া আর একজনের সুবিধা করিলে, অথবা কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যায় পূর্ব্বক কোন পক্ষ জয়লাভ করিলে বালকেরা কত মনোযোগের সহিত তাহার তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়! এই প্রণালীতে সমস্ত নৈতিক প্রশ্নের পরীক্ষা এবং নৈতিক উপকরণের

আমাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট হইলেও ইহা সংস্কার সাপেক্ষ। কেবল আহারই ভোজের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে; সামাজিক সম্মিলন ইহার অপর এবং উচ্চতর উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য। বাড়ীতে কে না আহার করে? কিন্তু অনেকগুলি ভদ্রলোকের একত্র সমাবেশ অতি দুর্লভ। এই সমাবেশ-দর্শন এবং প্রসিদ্ধ প্রবীণ লোকদিগের সারগর্ভ বাক্য-শ্রবণই নিমন্ত্রণে যাইবার প্রলোভন হওয়া উচিত। আহারে বসিয়া আমাদের সমাজে সভা করা শোভা পায় না, আহারের পরেও অসম্ভব; কিন্তু আহারের পূর্ব্বে এ উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত হইতে পারে, এবং পল্লীগ্রামে তাহা অনেক পরিমাণে হইয়াও থাকে। সুদূর মফস্বলে প্রকৃত সভার মত সভা কেবল নিমন্ত্রণ উপলক্ষেই হয়; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ঐ সকল সভায় সামাজিক শাসন বা দলাদলি সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, সমাজের মঙ্গল বা উন্নতি-সাধন-সম্বন্ধে তাহার শতাংশের একাংশ আলোচনাও হয় না। লোক যদি বিবেচক হয়, তবে এই সুযোগের সাহায্যে দেশের কত উপকার করিতে পারে। মফস্বলের মহাত্মাগণ যদি এ বিষয়ে কিছু উন্নতি দেখাইতে পারেন, তবেই মঙ্গল। সহরে নিমন্ত্রণের সুযোগও নাই, আর কালে ভদ্রে কখনও সুযোগ ঘটিলেও সহরের ব্যস্তবাগীশদিগের নিকটে এ বিষয়ের কোন আশা নাই। নিমন্ত্রণের সময়-নির্দ্ধারণই সর্ব্বপ্রথম সমস্যা। কিন্তু——অলমতি বিস্তরেণ।

অনুবাদক।

আলোচনা হয় না কি? দিবসের সমস্ত ব্যাপার ভোজনের সময়ে যেন অবাধে আলোচিত হইতে পারে; শিক্ষার এমন সুযোগ আর কিছুতেই মিলে না। এই সুযোগে পিতামাতার জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর বর্ণনা করিলে সন্তানেরা মনোযোগের সহিত তাহা শুনিয়া রাখে। যেস্থলে সন্তানের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার কথা, সেস্থলে যেন উচ্চ আদর্শের জীবন চিত্রিত হয়। কথায় ততটা প্রকাশ না করিলেও প্রায় সকলেরই মনের ভাব এই যে, রাজ-নৈতিক আলোচনায় বালকেরা শিখিবার কিছু পায় না, কিন্তু এ মত নিতান্ত ভ্রান্ত; আহার-কালীয় আলাপের বিষয়-সম্বন্ধে কোন সীমা নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য নহে। মানবীয় সমস্ত ব্যাপার সকলের পক্ষেই তুল্য, তবে অবশ্য পাত্র-ভেদে পরিমাণের তারতম্য আছে। অতএব বিষয়-গুলি বিস্তীর্ণভাবে গ্রহণ করিলে যাহাদের প্রয়োজনের বিস্তার সঙ্কীর্ণ তাহাদের প্রয়োজনও সেই সঙ্গে সিদ্ধ হইয়া যায়। ভাব এবং চিন্তাকে উন্নত করিবার ইহা যখন একটি প্রধান সুযোগ, তখন এস্থলে আপন প্রভাব বিস্তার করিবার অধিকার পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই প্রণালীর প্রসাদে, যে পরিবারের পিতামাতার পর্য্যবেক্ষা, চিন্তাশীলতা এবং বহুদর্শিতা যত অধিক, সেই পরিবারের সন্তানেরা তত সৌভাগ্যশালী। এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা যদি যুক্তি-সঙ্গত হয়, তাহা হইলে ভোজন-সময়ে পরিবারের সমস্ত বালকবালিকার একত্র সমাবেশে শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ লাভ হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিশুদিগকে পরের আদেশ শুনিতে হয় না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কথায় শিশু বলিয়া অবজ্ঞাত হইতে হয় না; এখানে প্রত্যেক বিষয়েই সকলে আপন আপন মনের কথা বলে এবং সে জন্য উৎসাহ পায়; আবার সর্ব্বোপরি অনুভূত পিতামাতার প্রভাব সকলকে মিলাইয়া মিশাইয়া রাখে। পারিবারিক আহারকালীয় আলাপে যেরূপ সরস আমোদ, অদ্ভুত কথা, কল্পনার খেলা, হাস্যকর ইঙ্গিতাদি এবং জটিল চিন্তা ও হৃদয়-প্রকম্পী ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই প্রণালীর গৃহ-শিক্ষা সম্পাদন করিতে হইলে শিশুগণ যাহাতে নিয়ত পিতামাতার সঙ্গে আহারে বইসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে শান্তির ব্যাঘাত হয় বলিয়া অনেকে ইহা বিরক্তিকর মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের এ বিষয়ে দুইটি ভ্রম রহিয়াছে। পরিবারের মধ্যে আলাপ করিতে যত্নের প্রয়োজন হয় না, অথচ ইহার প্রশান্ত প্রভাবে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। গৃহস্থালীর বন্দোবস্তের গুণে বা দোষে শিশু-শিক্ষার এই সুবিধা রাখা যাইতেও পারে, নষ্ট করা যাইতেও পারে। রন্ধন-শালায় শিশুদিগের আহারের ব্যবস্থা করিলে কোন কোন বিষয়ে সুবিধা আছে বটে, কিন্তু নিতান্ত শিশুদিগের জন্যই এ ব্যবস্থা হইতে পারে; নতুবা সকল বালকবালিকার জন্য সে বন্দোবস্ত করিলে শিক্ষার গতি প্রয়োজনীয় একটা সুযোগ এবং শক্তি নষ্ট করা

হয়। সন্তানের শিক্ষার জন্য পিতামাতা যাহা করিতে পারেন, ধাত্রীদ্বারা তাহা সম্পাদিত হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। যাঁহাদের অবস্থা ধাত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিবার অনুকূল নহে সন্তান-শিক্ষায় তাঁহাদের মনোযোগ থাকিলে দেখা যায়, তাঁহাদের পরিবারে সন্তান শিক্ষা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ধাত্রীদ্বারা এ কার্য্য হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প বলিয়াই বোধ হয়। শিক্ষা-বিধানে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, চলন চরিত্র শিক্ষা অপেক্ষা বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ভাব-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন শ্রেষ্ঠ। সুপরিচালিত কথোপকথনের প্রভাব বর্ণনা করা যায় না। এই উপায়ে বালকেরা দেশের প্রধান ঘটনা গুলি জানিতে পায়; সাহস এবং স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্তে তাহাদের হৃদয় উত্তেজিত হয়; অন্যের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি শিক্ষা করে; বড় বড় হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনার সংস্রব বুঝিতে পারে; এবং জগৎকে ধর্ম্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার বাসনায় উৎফুল্ল হয়। বর্ণনার উপযুক্ত প্রত্যেক ঘটনা, মনুষ্যের যত্ন-সাধিত প্রত্যেক হিতকর অনুষ্ঠান, জাতীয় অথবা অন্তর্জাতীয় উল্লেখ-যোগ্য প্রত্যেক ব্যাপার তাহাদের শিক্ষা-কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে। আহারকালীন আলাপ সময়ে সময়ে যদি এত উচ্চভাবের হয় যে বালকেরা তাহা বুঝিতে পারে না, সেও বরং ভাল, তথাপি সে আলাপ যেন নিতান্ত সামান্য বিষয়ে না হয়। সুন্দরভাবে বর্ণিত একটা হাস্যকর গল্প; উত্তেজিত ভাবে বর্ণিত কোন হৃদয়-দ্রাবক ঘটনা; পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত একটি সাধারণ কার্য্য; বিবেচনার সহিত সমালোচিত কাহারও একটি আচরণ; বিচার সঙ্গত এবং ন্যায়ানুমোদিত ভাবে উচ্চারিত প্রশংসা এবং নিন্দা-বাদ; এ সমস্তই অতি উচ্চভাবে শিক্ষার সাহায্য করে। এই প্রণালীতে বালকেরা সকল বিষয়েরই ভাল দিক্ দেখিতে, অন্যের প্রতি সহানুভূতি করিতে, সামাজিক জীবনের জটিলতা বুঝিতে, এবং ভাল মন্দ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা পায়। পিতামাতা যখন সন্তানের জীবনে এই সকল সুফল প্রত্যক্ষ করেন তখন এই সমস্ত তাঁহাদেরই সন্তান-শিক্ষার কৃতকার্য্যতার ফল ভাবিয়া তাঁহারা আনন্দিত হন।

সম্পূর্ণ